বিদ্রূপ ও বিকল্প।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এ, প্রণীত।

কলিকাতা,

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিসন যন্ত্রে
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

১৯৪৮ সংবৎ।

ভূমিকা।

যে হাসিতে পারে না, সে হয় রাক্ষস না হয় জীবন্তে মৃত। যে, আমোদ আহ্লাদ উপেক্ষা করিতে পারে, নরহত্যা পর্য্যন্ত তাহার অনায়াস সাধ্য। জ্ঞানলাভের জন্য মানসিক শ্রম, ধর্ম্ম-লাভের জন্য সদনুষ্ঠান, স্বাস্থ্যলাভের জন্য ব্যায়ামাদি, নিত্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু যন্ত্রাদির চক্রে চক্রে যেমন তৈল নিসেক না করিলে সকল কল বিকল হইয়া পড়ে, তেমনি এ সকলের সঙ্গে সঙ্গে যদি ক্রীড়া কৌতুক না থাকে, তবে অনতিবিলম্বে হৃদয় কঠোর হইয়া মনুষ্যত্ব বিহীন হইতে পারে। একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, লবণ না হইলে যেমন ব্যঞ্জনের স্বাদ হয় না, হাসি কৌতুক না থাকিলে তেমনি আলাপ বা সাহিত্য সুস্বাদু হয় না। সমগ্র জীব সৃষ্টির মধ্যে হাসিবার অধিকার মানুষের এক চেটিয়া; অন্য কোন জন্তু হাসিতে পারে, এপর্য্যন্ত জানা যায়

নাই। আমরা সেই মানুষের অধিকার পরি-ত্যাগ করিয়া গাম্ভীর্য্য এবং পাণ্ডিত্যের অনুরোধে, পশু প্রকৃতির অনুকরণ করিব কেন? আমি এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে হাসাইতে প্রয়াস পাইয়াছি। যদি পড়িয়া কাহারও অমনি হাসি পায় ভালই; না হয়, হাসাইতে পারিলাম না মনে করিয়াও কেহ কেহ হাসিতে পারেন ত?

ভ্রম সংশোধন।

১ পৃষ্ঠা ৪র্থ লাইনে দ্বার পরিগ্রহ স্থলে, দার পরিগ্রহ হইবে।

৩ পৃষ্ঠা শেষ লাইনে লোকহিতৈষা স্থলে, লোকহিতৈষণা হইবে।

সূচী।

বিদ্রুপ।

বিকল্প।

বিদ্রূপ।

"Ridicule shall frequently prevail
And cut the knot when graver reasons fail

—*Francis.*

বিদ্রূপ।

বাস্তু পুরুষ।

চঞ্চলচরণ একদিন মনে করিলেন, এ সংসারের সকলি অনিত্য। সুখ দুঃখ সকলি ছায়াবাজি; "কে আমার আমি কার।" সুতরাং দ্বার-পরিগ্রহ করিবেন না, অথবা সংসারের অন্য কোন সুখে মন দিবেন না, এক প্রকার স্থির হইল। সকলি স্থির, কিন্তু মন একটু অস্থির। কথা এই, বিনা উপলক্ষে দিন কাটে না; তখন, পরদুঃখ বিমোচনে জীবন উৎসর্গ করা নিশ্চিত হইল। একদিন চঞ্চলচরণ, কাহার উপকার করিবেন, এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া রাস্তায় বেড়াইতেছেন, এমন সময় একটি লোক, জাতিতে

স্ত্রী, রূপে সুন্দরী, বয়সে যুবতী, ঘাটে কাহার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া ঘরে ফিরিতেছিলেন ; চক্ষে দুই এক ফোঁটা জল, পলাশের পাঁপ-ড়িতে স্থূল শিশির কণার মত শোভা পাই-তেছিল, অভিমানকুঞ্চীকৃত রক্তাধর প্রবাল শোভাকে নিন্দা করিতেছিল। "তাংবীক্ষ্য সর্ব্বাবয়বানবদ্যাং", পরদুঃখ-কাতর হৃদয় চঞ্চলচরণ, গ্রাবা "রোদিত্যপি দলতি চ বজ্রস্য হৃদয়ং" ভাবিয়া হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "সুন্দরি, কি মর্ম্মন্তুদ দুঃখে তোমার অন্তর্দাহ উপস্থিত ?" সহসা রাস্তায় বড় গোল পড়িয়া গেল ; যাহারা সংসার-কলুষক্লিষ্ট হৃদয়, তাহারা কি ভাবিল, জানি না, অথবা "সং-কার্য্য সকল সময়ে সুফল প্রসব করে না, কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, চঞ্চলচরণ রাস্তার খানায় পড়িয়া, এক খানি চরণ সম্পূর্ণ খোড়া। রাত্রিটা সেই খানেই কাটিতে-

ছিল। চঞ্চল-চরণ দুঃখে ও ক্ষোভে মনে করিতেছিলেন, "ছেদশ্চন্দনচূত চম্পক বনে রক্ষা করীর দ্রুমে" ইত্যাদি। এমন সময় তাঁহার বাস্তুপুরুষ আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "বাপু চঞ্চলচরণ, আমি তোমার বাস্তুপুরুষ, তোমার চিত্ত বিনোদনের জন্য আসিয়াছি।" চঞ্চলচরণ নমস্কার করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, খোঁড়া পা ভাল করিয়া দিবেন কি?" বাস্তুপুরুষ বলিলেন, "সেটি হবে না, তবে আমি তোমার বাস্তু-পুরুষ, তোমার কল্যাণে সর্ব্বদা নিযুক্ত, যাহাতে আর বিপৎপাত না হয়, তাহারই জন্য" আসিয়াছি।" "চঞ্চল বলিলেন, "আর কি করিবে, খোঁড়া পা ত ভাল করিতে পারিবে না; আর যদি আমার কল্যাণেই তুমি ব্যস্ত, তবে ৪। ৫ ঘণ্টা পূর্ব্বে, যখন আমার মনে লোকহিতৈষা প্রবল হইয়াছিল,

তখন আসিয়া বাধা দিলে না কেন ?" বাস্তু-পুরুষ বলিলেন, "ঠিক্ সেই সময়ে, আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গুরুতর বিপদে তাহার চিত্তবিনোদন করিতেছিলাম।" চঞ্চলঃ—"ঠাকুর, তাঁহার আবার কি ?" বাস্তু-পুরুষঃ—"তিনি তোমা অপেক্ষাও অধিকতর পরোপকার করিতে গিয়া দুখানি পা সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়াছেন, সম্প্রতি জেলখানায়।" চঞ্চল তখন কহিলঃ—"ভাল কথা, এক ভাই রাস্তার খানায়, আর এক ভাই জেলখানায় ; আমি খোঁড়া, দাদার তো শুনিতেছি পা আদপেই নাই ; "হে কল্যাণতৎপর বাস্তুপুরুষ, তুমি বিদায় হও। তুমি বাস্তুপুরুষ নহ, বাস্তুঘুঘু।"

নব্য-ভারত, ফাল্গুণ ১২৯৬। } পৌষ।

স্কুল মাষ্টার।

আমি বিদ্যালয়ের শিক্ষক, আমার ইংরাজি নাম স্কুলমাষ্টার। ছেলে পড়াইয়া (পোড়াইয়াও বটে) খাই বলিয়া যে দেশের মঙ্গল চিন্তা করি না, রাজনৈতিক আন্দোলন করি না, এমন নয়। এ বৎসর আমার কংগ্রেসে ডেলিগেট্ হইবারও সম্ভাবনা ছিল। আমি একদিন এক খানা সংবাদ পত্র পড়িয়া জানিলাম (ইংরাজি কি বাঙ্গলা স্মরণ নাই; কারণ উভয় ভাষাই আমার আয়ত্তে) যে সিবিল সর্ব্বিসে বয়স বাড়িয়া গেল। সম্পাদক বড় খুসী; আমার কিন্তু ভাবনা ঘোচে না। আমি ভাবিলাম যে, ডিমের অবস্থায় কাক ও কোকিল একই রূপ; কিন্তু ডিম ফুটিলে অনেক প্রভেদ। বয়স যদি বাড়িয়া গেল, তবে তো অনেক কৃতবিদ্য ইংরেজ যুবক

এ পরীক্ষায় উপস্থিত হইবে; তখন দেশী ভায়ারা আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন কি? দেশের ভাবনায় বড়ই ক্লিষ্ট হইয়া শিয়ালদহের পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র মাঠে পাদচারণ করিতেছি, এমন সময় দেখি, একখানি রেলের গাড়ী, বজ্রনাদ ছাড়িয়া, ধূম উদ্গার করিয়া, লক্ষযাত্রী বুকে পূরিয়া চলিয়া গেল। নিকটে একটি অশ্ব ও গর্দ্দভ বাঁধা ছিল, উভয়েই আনন্দে ঘাস খাইতেছিল, গাধার চিত্ত বিকার নাই,—ঘাসই খাইতেছে, কিন্তু ঘোড়াটি একটু চমকিয়া, গাধার দিকে চাহিয়া হ্রেষা রব করিতে লাগিল। কিছু দিন পূর্ব্বে কমলাকান্তের দপ্তর মুক্তাবলী পড়িয়াছিলাম বলিয়াই হউক, অথবা রোমানে সাহেবের Animal intelligence এর কৃপাতেই হউক, আমি বুঝিলাম, অশ্ব গর্দ্দভে কথোপকথন চলিতেছে। ঘোড়া কহিলঃ—"ওহে গাধা,

দেখিলে তো মানুষের অকৃতজ্ঞতা; যখন ওয়াটকুলের অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ বনে আমাদেরই মত হীনাবস্থায় ছিলেন, তখনও আমরা সীজরকে পীঠে করিয়া ছুটিয়াছি। এখন মানুষ যে কল করিয়াছে, তাহাতে আর আমাদের পীঠে চাপিবে কি? সুতরাং দিনে দিনে দানাপানি উঠিল দেখিতেছি।" গাধা কহিলঃ,—"ভায়া, ও ভাবনা আমার নাই, এই যে আমার খ্রীষ্ট-পদার্পণ-পূত-পৃষ্ঠ ইহা ছাড়া মাঠের ঘাস, ছাই পাঁশ, আমার মহিমার ধ্বজা ধোপার বোঝা, আর কেহ বহিবে না। সুতরাং আমার ঘাস জল অক্ষয় ও অবিনশ্বর।" গাধা আনন্দে ঘাস চর্ব্বণ করিতে লাগিল, যত দুঃখ ঘোড়ার। আমি দেখিয়া শুনিয়া শিক্ষা লাভ করিলাম। সিবিল সর্ব্বিসের মাথায় ফুল চন্দনই পড়ুক, আর বজ্রাঘাতই হউক, আমার কি? গাধা

তুমি বাঁচিয়া থাক ; স্কুলমাষ্টার ও কেরাণী-কুলের অন্ন মারে কে ?

নব্য-ভারত, ফাল্গুণ ১২৯৬। } পৌষ।

নবকবি।

(মঙ্গলাচরণ ও অভ্যর্থনা)

গৃহস্থের ঘরে প্রথা আছে যে, একটি শিশুর জন্ম হইলেই পুরবাসিনীগণ আনন্দোৎসব করিয়া নবজাত সন্তানের জন্মবার্ত্তা ঘোষণা করিয়া থাকেন। ছেলে কাণা-খোঁড়া হইলেও উৎসব বাদ যায় না ; তবে প্রসূতীর পোড়া-কপালের জন্য দশ জনে একবার "আহা" বলে এই মাত্র। কিন্তু এই বাঙ্গালা সাহিত্য-সংসারে কত যে নবকবি, নবরবির প্রভায়, দৈনিকের অনাবৃত মাঠে, সাপ্তাহিকের হট্টমন্দিরে, মাসিকের পর্ণকুটীরে,

জন্মিয়া রোদনের সুর তোলে, তাহাতে কত লোকের নিদ্রারও ব্যাঘাত ঘটে, তবুও কেহ, মঙ্গলাচরণ দূরে থাকুক, একবার "আহা"ও বলে না। অনেকে বলেন যে বাঙ্গালা সাহিত্যপুরে "পুরবাসিনী" বড় কম, তাই এই দুরদৃষ্ট। কিন্তু কুলীন ব্রাহ্মণ যখন অশীতি বর্ষ বয়সে প্রবাসে কাহারো কুল পবিত্র করিতে বসেন, তখন যেমন স্ত্রী-আচার গুলি পুরুষের ঘাড়েই পড়ে,' সেইরূপ কেন আমরা দশজন পুরুষে মিলিয়াই এই মঙ্গলাচরণটা করিব না ?

যাঁহার জন্য আমার এই প্রবন্ধের আড়ম্বর, ইঁহার নাম কল্কিচন্দ্র। জন্মকালে বুদ্ধদেবের নাম হইয়াছিল সিদ্ধার্থ; ইঁহারও নামে তেমনি ভবিষ্যৎ সূচিত হইয়াছিল। ইনি পদ্যে ও গদ্যে উভয়বিধ উপায়েই কবিতা লিখিয়া থাকেন। গদ্যে যে কবিতা

লেখাযায় ইহার প্রমাণ বোধ হয় চাই না ; কোল্‌রিজ্ হইতে হুইটম্যান্ পর্য্যন্ত অনেকে ইহার প্রমাণস্থল। সম্প্রতি ইনি "কুসুমের আত্মহত্যা" নামক একখানা পদ্যকবিতা লিখিয়াছিলেন ; ব্যাপারটা ট্রেজডি। প্রথম দেখুন যে, কুসুমের অত্মহত্যা এই নামটিই কেমন কবিত্বপূর্ণ ! তাহার পর, প্রারম্ভে ;—

একটী আলোক রেখা ঘোর অন্ধকারে ভাসে,
নীলগগনের কোলে একটী তারকা হাসে,
সে আলোকে সে আঁধারে কি জানি কাহার কথা,
বসন্ত হিল্লোল সম কাঁপায়ে ভাবের লতা,
কোথা হোতে ভেসে এসে কোথায় মিশিয়ে যায়,
আঁধার পরাণ মোর সুধু করে হায় হায়।"

কি চমৎকার ! ভাসে হাসে, কথা লতা, যায় হায় ; মিলের ত্রুটি নাই। তার পর

ভাবের ও কবিত্বের ছটাই বা কত। 'একটী আলোক রেখা' ও একটী তারকা, দুইটী নয়। কি গম্ভীর ভাব! আরো আছে, "কি জানি কাহার কথা" "কোথা হোতে ভেসে এসে" "কোথায় মিশিয়া যায়!!" সুতরাং এযে খুব উচ্চ দরের Suggestive (পোড়া কথার বাঙ্গালা যুটিল না) কবিতা, তাহাতে কাহারও সন্দেহ আছে কি?

যে স্থানে মলয় সমীরণের অনাদরে, কুসুম, লতার ফাঁস গলায় জড়াইয়া শিশিরাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে ভগ্ন হৃদয়ে আত্মহত্যা করিতেছেন সে স্থানটী কি pathetic বা শোকপূর্ণ! সে স্থানে ছন্দও স্বাধীন ভাব ধারণ করিয়াছে, সোণায়সোহাগা মিলিয়াছে;—

"পোড়া কুসুমের ঘরে,
কেন গো সে এসেছিল দুদিনের তরে?

আজি মোরে একা ফেলে কোথা গেল গো ?
প্রাণ সদা কেঁদে বলে,
মন যেন কেঁদে বলে,
আকুল হইয়া যেন ঐ এক কথা বলে ;
কোথা গেল কোথা গেল গো ?
আহা যদি চলে গেল বলে কেন গেল না ?
তাই ভাবি রে ;
ভুলিনু পরের প্রেমে আমি হাবি রে ;
এখন পরাণ তুই কোথা যাবি রে ?
সে যদি গো আসে ফিরে দেখিবে হেথায় ;
মরিয়া রয়েছি ঝুলে মাধবী লতায় !
ফুরালো এখন,
প্রেমের স্বপন ।
যেন গো তখন,
সেই প্রিয় ধন,
জন্মের মতন,
করে আসিয়ে সমাধি রচন !"

কি গভীর শোকের মধুর উচ্ছ্বাস !!

তাহার পর যেখানে মলয় সমীরণ ফিরিয়া আসিয়া মৃত কুসুমতী দেখিলেন, সেস্থানে আছেঃ—

"আঁচল পাতিয়া রেতে ফুল বালাটি,
বসিয়ে কুড়াতেছিল জ্যোছনা যথায়,
—হায়রে স্মরিলে কথা বুক যায় ফাটি—
আছে শুষ্ক দেহ তথা ঝুলিয়ে লতায় !
হুহু কোরে কাঁদিছে মলয়,
বলিতেছে, কেহ কার নয় ;
তার দুঃখে কাঁদিছে পাপিয়া
সে রোদনে বিদরিছে হিয়া ।
কোকিল ডাকিছে কুহু,
মর্ম্মে জাগে শত উহু,
কুসুম বালার শোকে বসন্ত মরিল ;
উদাসী সন্ন্যাসী হোয়ে মলয় চলিল !"

এই কয়েকটী ছত্র লিখিতে লিখিতে

কবির অনেকবার অশ্রুপাত হইয়াছিল, তিনি নিজে বলিয়াছেন! বাঙ্গালা সাহিত্যের দুরবস্থা এই, কবিচন্দ্র এ সংসারে আদৃত হইলেন না। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, যদি আমরা নির্ব্বংশ না হই, তবে কাব্যামোদী ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা এজন্য আমাদিগকে তিরস্কার করিবেন। কেন না, "কালোহ্যোয়ং নিরবধি বিপুলাচ পৃথ্বী।"

ইহাঁর গদ্যের কবিতার একটি নমুনা তুলিয়া আজিকার মত অবসর লইব। যে কয়েক ছত্র তুলিতেছি, ইহা তাঁহার কোন কাব্যের অংশ বিশেষ নহে—সেই টুকুই পূর্ণ কাব্য। সকল কথা খুলিয়া লিখিলে কাব্যের রস কিছু তরল হইয়া যায় বলিয়া, কবি, প্রথম অবস্থার ঘটনাগুলি চাপিয়া রাখিয়া লিখিতেছেন :—"নবীন যুবক কুরুবক বৃক্ষতলে, শ্রান্তি দূরচ্ছলে, জ্যোছনায় অঙ্গ ঢালিয়া

সেই মুখ খানি, সেই কিছুতেই-ভুলিতে-পারি-না-পারা-অসম্ভব-কি-জানি-মনে-পড়ে-মুখখানি ধ্যান করিতেছিলেন। হেন কালে, ডালে ডালে, কোকিলের গীতিধ্বনি, "বিষসম মনে গনি," ফুটিয়া উঠিল; তাহাতে অতীতের স্বপ্ন, স্বপ্নের মাধুরী, মাধুরীর কোমলতা, কোমলতার চাঞ্চল্য, চাঞ্চল্যের আবেগ এক সঙ্গে হৃদয়ের স্তরে স্তরে ঢলিয়া পড়িল! সহসা অবশেষে পৃষ্ঠদেশে কে অঙ্গুলি স্পর্শ করিল! সেকি স্পর্শ! সেকি হর্ষ! বর্ষ বর্ষ বলিলে ফুরায় না! তখন ললিত-ভৈরব-ইমন-কেদারা স্বরে, তাঁহার মর্ম্ম ভেদ করিয়া, তন্ত্রীচ্ছেদ করিয়া, রোদন স্বর উঠিল! "তুমি ভাল বাসিলে কেন? যদি ভাল বাসিলে তবে আসিলে কেন?" এইরূপ বিচ্ছেদ চিন্তায় ও রোদনে; নিরাশায় সেই বিজনে, যুবক যুবতী মানবলীলা সংস্মরণ করিলেন!!

কুরুবক ফুল ঢালিয়া সমাধি রচনা করিল !!! আজিও সেই মাঠে সেই কুরুবক বৃক্ষ আছে, কিন্তু যুবক যুবতী কোই ? উঃ প্রকৃতির নির্দ্দয়তা আর সহ্য হয় না ! সে যুবক যুবতী নাই, সে ইতিহাস নাই, কিন্তু সে মাঠের নাম রহিয়া গিয়াছে "প্রেমখেকো মাঠ ।"

আমরা দর্প করিয়া বলিতেছি, যে, যে ভাষায় এরূপ মাধুর্য্যের বৃষ্টি, কবিত্বের সৃষ্টি, সে ভাষার বিপদের "রিষ্টি" কাটিয়া গিয়াছে । এবং এ মাধুর্য্যের তুলনায় চিনি তিক্ত হইল, কোকিল ভেক হইল; এবং প্রশংসার ভাষা ফুরাইল বলিয়া আমাদেরও প্রবন্ধের শেষ হইল ।

—ফাল্গুন ১২৯।—

অবিনাশ লীলা।

আদি, চিরদিনই অন্ধকারে নিহিত। যিনি বিশ্বাদ্য বিশ্ববীজ, তিনি ভিন্ন কে বলিবে, শ্রীমান অবিনাশ কোথায়, কোন সালে, কাহার গৃহে, জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? ব্যাসের দিব্য জ্ঞান, কিম্বা মার্লিণের বীণা, এই ক্ষুদ্র লিপিজীবী প্রাপ্ত হয়েন নাই; সুতরাং সে তত্ত্ববিশ্লেষনের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তিনি মাতুলগৃহে প্রতিপালিত পিতৃমাতৃহীন কুলীন সন্তান। শত্রু প্রতিবেশীরা বলিত, অবিনাশ কুরূপ, কদাকার; কিন্তু তাঁহার মাতুল মাতুলাণী, পরভৃতের দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেন, "কোকিল যে কাল তাহে কিবা আসে যায়।" আর সুরূপ ও কুরূপ কাহাকে বলে বড় বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তোমার শুকচঞ্চু-

নাসা, অমৃত-ক্ষরণী ভাষা, চাঁদের মত মুখ, কবাটের মত বুক ; কিন্তু তুমি আমরণ একটা বিবাহ জুটাইয়া উঠিতে পারিলে না ; আর শ্রীমান অবিনাশ, অজ্ঞানে ও সজ্ঞানে তিনটী সালঙ্কৃতা বালিকার একাধিপতি হইয়া দাঁড়াইলেন। যদি ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন পড়িয়া থাক, তবে জিজ্ঞাসা করি, কে সুশ্রী কে বিশ্রী ?

অবিনাশের মাতুল-গৃহ কলিকাতায়। তাঁহার মাতুল যে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে ধনী বলা যাইতে পারে। তাঁহার সন্তানাদির মধ্যে, কেবল অবিনাশেরও বয়োকনিষ্ঠা এক কন্যা ছিল, সেও আবার পঞ্চমবর্ষে বিধবা হয়। অবিনাশ, পুত্রহীন ধনীর গৃহে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন।

যথাসময়ে অবিনাশ বিদ্যালয়ে প্রেরিত

হইলেন। অবিনাশের বিদ্যা হয়, এবিষয়ে মাতুলের দৃষ্টি ছিল : অর্থাৎ তিনি অনুসন্ধান লইতেন যে অবিনাশ নিত্য বিদ্যালয়ে যায় কি না, এবং গৃহে যথাসময়ে পুস্তক খুলিয়া বসে কি না। কিন্তু ইহার কোনটীতেই অবি-নাশের ত্রুটি ছিল না। একদিন পণ্ডিত বলিলেন :—"অবিনাশ লেখা পড়া করে না। কিন্তু যাহাহউক প্রতিদিন স্কূলে আসিবার অভ্যাসটী রাখিয়াছে।" শুনিবা মাত্র অবি-নাশ হাত নাড়িয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল :— "মশাই, ঝাড়া ৫টি ঘণ্টা এত ইয়ারদোস্ত কোথা জোটে বলুন?" পণ্ডিত দ্বিরুক্তি করিলেন না; সমপাঠিগণ সেদিন অবি-নাশের নির্ভিক সুরসিকতার প্রশংসাবাদ করিলেন। পণ্ডিতটীর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, তিনি আর এক দিন অবিনাশকে "স্ত্রী" শব্দের রূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; অবিনাশ অমনি

বলিয়া উঠিলেন ঃ—"তিনটির তিন রূপ (তিন বিবাহের কথা পাঠকের স্মরণ থাকিবে), তবে সাধারণতঃ ইন্দিবরনয়নী; পদ্মবদণী—,” পণ্ডিত আর সহ্য করিতে না পারিয়া প্রহারের জন্য ধাবিত হইলেন, অবিনাশ ক্লাশের চারিদিকে ছুটিয়া ঘুরিতে লাগিল; এবং হাসির উপর হাসির ধ্বনিতে ক্লাশ পরিপূর্ণ হইল। ইন্দিবর নয়ন শুনিয়াই পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন যে, অবিনাশ অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থের Private Study আরম্ভ করিয়াছিল। রাত্রিদিন সে নভেল নাটকই পড়িত, সুতরাং মাতুল ভাবিতেন যে ছেলেটির লেখা পড়ায় মনোযোগ আছে।

পুস্তক পড়িয়া যাহারা কেবল কথার রাশি বহিয়া মরে তাহারা গর্দ্দভ; অবিনাশ পুস্তকাদি হইতে অনেক সার সংগ্রহ করিয়াছিল। অধ্যয়নের সুফলে তাহার অনেক প্রাচীন

কুসংস্কার চূর্ণ হইয়া গেল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহার মাতুলের এক বিধবা কন্যা ছিল ; যখন অবিনাশের বয়োপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে "দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা" হইল, তখন কুসংস্কার পরিশূন্য অবিনাশ, সেই বালিকার সহিত নির্দ্দোষ flirt আরম্ভের উদ্যোগ দেখিল। সেই দিন হইতে সে বালিকা সাড়ে তিন হাত ঘোমটা টানিয়া সাবধানে অবিনাশ হইতে দূরে থাকিত। Cousin সম্পর্কে প্রেজুডিস্ থাকা অসভ্যতা, ইহা তিনি অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহ বুঝিল না। বরং তাহার মাতুল মাতুলানী বালিকাটীর সহিত যাহাতে তাহার আদৌ সাক্ষাৎ না হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিলেন। তখন অবিনাশ রাগে ও ক্ষোভে আওড়াইতে লাগিল, "ওরে দুষ্ট দেশাচার, কি করিলি অব-লার।" কেবল সেই বালিকা কেন, সুসংস্কা-

রের চোটে তাঁহার মাতুল পর্য্যন্ত পারত পক্ষে তাহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইতেন না। কারণ অপ্রয়োজনেও, তাঁহাকে দেখিবামাত্র অবিনাশ কুসংস্কার শূন্যতার পরিচয় স্বরূপে, মুখের উপর চুরুট ফুঁকিত।

এই সময় অবিনাশ ব্রাহ্মসমাজের বিষয় কিছু অবগত হইল। অর্থাৎ শুনিল যে, ব্রাহ্ম নামে এক সম্প্রদায় আছে, যাহারা অনেক কুসংস্কার মানে না। অবিনাশ সুযোগ ভাবিয়া ব্রাহ্মসমাজ খুঁজিয়া লইল। কিন্তু গিয়া দেখে ভারি বিপদ। ব্রাহ্মেরা যে কুসংস্কার মানে না, সেগুলি তাহার পক্ষে সুবিধাজনক নয়। প্রথমতঃ সে পরমেশ্বর পরমেশ্বর করিয়া চেঁচাইতে রাজি নয়। দ্বিতীয়তঃ বহু-বিবাহের দ্বারা কেমন অন্তঃ-করণ বিবিধ প্রকার প্রেমে অভিসিঞ্চিত হইয়া উঠে, সে সকল কথা যাহারা বুঝে না,

তাহাদের সহিত তাহার বনিবনাও হইবার সম্ভাবনা দেখিল না। কিন্তু অনেক ব্রাহ্ম, স্ত্রী স্বাধীনতা দিয়াছেন দেখিয়া, ব্রাহ্মদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ হইবার আশা একেবারে ছাড়িল না; কিন্তু একদিন, সে একজন স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইয়া এমন লাঞ্ছিত হইল, যে, রাগ করিয়া ব্রাহ্মসঙ্গ চিরদিনের মত ত্যাগ করিল। শুধু ত্যাগ করিল তাহাই নয়; অধিকন্তু তাহাদের নামে অনেক কুৎসা রচনা করিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে অবিনাশের মাতুল মাতুলাণী বিয়োগ, সম্পত্তির অধিকার লাভ; এবং তৃতীয় শ্রেণী হইতে স্কুল ত্যাগ ঘটিল। অবিনাশ ধনী, ব্রাহ্মনিন্দা তৎপর, সুতরাং অবিলম্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল যে, সে একজন হিন্দুধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক, কৃতবিদ্য অথচ অবিকৃত মস্তিষ্ক

যুবা পুরুষ। অবিনাশ "ত্রি বিবাহের আধ্যাত্মিক ভাব" বিষয়ে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছিল, তাহা শুনিয়া অনেকে তাহার শাস্ত্রজ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছিল। আমরা সে বক্তৃতার একটী কথা মনে রাখিয়াছি; সে বলিয়াছিলঃ—"দেখ জগৎপতি তিন, অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর; তিনটী ভুবন, যথা স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল, এবং তিনে নেত্র—সে কথাতো পাঠশালার বালকও জানে; অথচ পলিতকেশ, গলিত দন্ত, অনেক চক্ষু বোঁজার দলের লোক, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না যে, ত্রি বিবাহে কি আধ্যাত্মিকতা লুক্কায়িত। হা, শাস্ত্র, তুমি কি লোপ পাইলে; হা, ভারত মাতা, তোমার কি এই হইল; হা, মুনি ঋষিগণ তোমরা কি মরিয়াছ; এবং হে কল্কে! (উদ্দেশ্য ছিল বলিলেন কল্কি, কিন্তু অতি-পরিচয়ে সেই বিশ্রাম দাতাকেই মনে

পড়িল) তুমি কবে পাষণ্ড দলন করিবে ?" শীঘ্রই প্রচারিত হইল যে তিনি "তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম্মের উৎকর্ষ" নামক এক পুস্তক প্রচার করিবেন। সম্প্রতি তৎসম্পর্কীয় "পঞ্চবিধ" যোগের Experiment বা পরীক্ষায় নিযুক্ত আছেন। এ পরীক্ষায় অনেক সময় লাগিবে ; সুতরাং এখন সে পুস্তকের বিষয় কিছু বলিতে পারিলাম না। কেহ নিরাশ হইবেন না ; অবিনাশ এখনও জীবিত। পঞ্চ "ম"কার সাধন তত্ত্ব দ্বারা তিনি জগৎকে উপকৃত করিবেনই করিবেন। অলমতি পল্লবিতেন।

রামায়ণ বিষয়ে কথোপকথন।

রামধন। হরিহর বাবু আপনাদের কাছে আমাদের আসিতে লজ্জা করে ; আপনারা কৃতবিদ্য, জ্ঞানী, আমরা নিরক্ষর মূর্খ।

হরিহর। (সগর্ব্বে) তা কেন, তা কেন; বলি রামধন, বেশ ভাল আছ ত?

রামধন। আমাদের আর ভালমন্দ কি? যে দিন কাল পড়েছে, তাতে ইংরাজি না জান্‌লে তো দু পয়সা রোজগারের প্রত্যাশা নেই, সর্ব্বদাই অর্থ চিন্তায় বিব্রত।

হরিহর। এক অর্থে অর্থ চিন্তা সকলেরই আছে। তোমরা না হয়, টাকা কড়ি রূপ অর্থেরি কথা ভাব, আমরাও পদের অর্থ নিয়ে অনেক সময়েই চিন্তাগ্রস্ত। কাল একটা সমস্যার হাতে পড়ে সারারাত্রি ঘুম হয় নি।

রামধন। (হাসিয়া) মহাশয়, সেতো সুখের চিন্তা। পেটে যদি ক্ষুধা না থাকে, তবে অমন চিন্তা কর্ত্তে ভাবনাটা কি?

হরিহর। বল কি, এই যে সমস্যাটার কথা বল্‌ছিলাম, অনেক কষ্টে তার মীমাংসা হওয়ায় আজ একটু ভাল আছি।

রামধন। আপনাদের কাছে বসিলে যাহোক কিছু শিক্ষার প্রত্যাশা করা যায়। আপনি যে সমস্যা পূরণ করেছেন, সেটা বলিলে আমরা বুঝিতে পারি কি ?

হরিহর। তা অনায়াসে; আমি খুব সহজে বুঝিয়ে দেবো। কথাটার এখন মীমাংসা হইয়া গিয়াছে; আর গোল নাই। কিন্তু এতাবৎকাল সমস্ত পৃথিবীর লোক, সেই ছোট কথাটার ভ্রান্তিতে পড়িয়াছিল; কি আশ্চর্য্য ?

রামধন। বলুন, শোনা যাক্; দেখি আমারও যদি ভ্রান্তিটা ঘোচে।

হরিহর। কথাটা এই যে, এ পর্য্যন্ত লোকে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিল যে, বাল্মীকি নামে একজন কবি, রামায়ণ নামে একখানা গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। কি ভ্রান্তি দেখ দেখি ?

রামধন। ইহার ভ্রান্তি কোন্ কথাটায় ? বাল্মীকি বলিয়া যে কেহ কবি ছিলেন, সেইটী ভুল ; না, তিনিই যে রামায়ণ প্রণয়ণ করিয়াছিলেন, সেইটীই ভুল ?

হরিহর। কি বল্‌ব রামধন, উহার আগাগোড়াই ভুল। রাম ভুল, রামায়ণ ভুল, বাল্মীকিও ভুল।

রামধন। কি বলেন মহাশয়, আমি কাল যে এত দুঃখেও পাঁচ সিকা খরচ করিয়া একখানা রামায়ণ কিনিয়াছি।

হরিহর। You have paid for your foolishness, যা হবার তা হোযেছে। উঃ, কাল যদি আমার চিন্তায় এ প্রহেলিকার রহস্যোদ্ভেদ না হ'ত, তা হলে আরও, না জানি কত লোকের কত কাল এই ভ্রমের দণ্ড ভোগ করিতে হইত।

রামধন। আপনি যে এত দিনের এত

বড় কথাটাকে ভুল বলিয়া বসিলেন, তা, কি রকম কি বলুন দেখি?

হরিহর। এর আবার রকম সকম কি? যা ভুল, তা ভুল, অর্থাৎ কোন ক্রমেই সত্য নয়। সেটা বুঝলেত? না হয়, আর একটু খুলে বলি। এই মনে কর, চারি দিকে চারিটি অক্ষর A, I, E, O; এখন যদি O সত্য হয়, তবে A ভুল। কারণ উহারা সম্পূর্ণ বিপরীত বা Contradictory। সুতরাং যখন বলা গেল যে একটী সম্পূর্ণ ভুল, তখন আর একটী আদৌ সত্য হইতে পারে না।

রামধন। (কাতর দৃষ্টিতে) কিছুই বুঝিলাম না।

রামধন। আঃ, ওইত বিপদ; Logic পড়া না থাকলে বড় গোল! তা, A, I, E, O, র পরিবর্ত্তে ক, খ, গ, ঘ, ভাবিয়া লইলেও চলে।

হরিহর। (সম্পূর্ণ নিরাশভাবে) হুঁ, তা ঐ গোড়ার কথাটা আগে বুঝাইয়া দিন যে রামায়ণটা ভুল; তার পরে না হয় আপনার এ কথাটা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

হরিহর। কি জান, Foundation টা ঠিক করা চাই; তা যাক্, তোমাকে না হয় একটু উল্টাপদ্ধতিতেই বুঝান যাক্।

রামধন। (সাগ্রহে) সেই বেশ্।

হরিহর। প্রথম দেখ রামায়ণটাই ভুল; অর্থাৎ রামায়ণ বলিয়া কোন পুস্তক রচিত হইয়াছিল, ইহার সম্পূর্ণ প্রমাণাভাব।

রামধন। অ্যাঁ বলেন কি? তবে আমি যেখানা কাল কিনিলাম, সেখানা কি শনির পাচালী?

হরিহর। তা কেন, তোমরা এখন যে বই দেখিতে পাও, সে খানা সম্পূর্ণ জাল; Spurious Copy.

রামধন। আসল থাকিলে তো তার নকল হয়? গোড়ায় যাহা নেই, তাহার আবার জাল হইল কি প্রকারে?

হরিহর। What a tedious fool! গোড়ায় যে একখানা রামায়ণ ছিল; তাহার যে কোন প্রমাণ নাই, সেটা বোঝ না কেন?

রামধন। মহাশয়, গোড়া বলিতে আপনি কি বুঝিলেন, তা ত বুঝিলাম না। যখন সেই জাল হউক নকল হউক, একখানা হইল, সেই সময়েই ত একখানা হইল বুঝিব?

হরিহর। তোমার এত মোটা বুদ্ধি কেন বল দেখি? যখন গোড়ায় ছিল না, তুমি স্বীকার কচ্চ, তখন যা হল, সেটা জাল। যেটা জাল, সেটা যে আর ঠিক নয়, এটা বুঝ্‌তে আর গোল কর কেন?

(গদাধরের প্রবেশ)

ওহে গদাধর বাবু, শোন শোন, রামধনকে এই সোজা কথাটা বুঝাতে পাচ্চিনে যে, যেটা "জাল" সেটা আসল নয়।

গদাধর (হাসিয়া) এর আবার একটা কথাই কি!

হরিহর। তাইত ভাই, দেখ দেখি, What egregious ass!

গদাধর। কিহে রামধন, "জাল" ও "আসল" এর প্রভেদ বুঝ্‌তে পাচ্চ না? "জাল" অর্থ যে ধীবরের মৎস্য ধরিবার যন্ত্র বিশেষ, তা নয়। "জাল" অর্থ——

রামধন। (সবিনয়ে) আজ্ঞে এব্বার বুঝেছি (স্বগতঃ) কি আপদ! এই এদের বিদ্যা বুদ্ধি! ভগবান করুন মূর্খ হইয়াই থাকি!

হরিহর। (সদর্পে) আচ্ছা ও Proposition এই পর্য্যন্ত। এখন দেখ, সেই জালের মধ্যে আবার কত জাল!

রামধন। (হাল ছাড়িয়া দিয়া) আজ্ঞে বলুন।

হরিহর। প্রথমে তো দেখান গেল যে, রামায়ণ বলিয়া এখন যে গ্রন্থ পাওয়া যায়, সেখানা জাল। তারপর সেই জাল গ্রন্থেরও প্রথম সংস্করণ যাহা পাওয়া গিয়াছিল, তাহার সহিত একালের গুলির মিল নাই।

গদাধর। (না বুঝিয়া) ওহো, তুমি বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের Difference টা cstablish কচ্চ ? কর, আমি যাই।

(প্রস্থান)

হরিহর। (গদাধরের কথা না শুনিয়া) প্রথম সংস্করণের যে বই, অর্থাৎ যেখানা ৩০২ সালে আলেক্‌জেণ্ডর প্রথম প্রাপ্ত হন ; আর এসিয়াটিক সোসাইটীতে যেখানা এখনো কীটদষ্ট অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহাতে রাম বলিয়া কাহারও নামই নাই।

রামধন। হরিবল হরি! আমার ঠাকুর অনেক সাধে আমার নাম রাখিয়াছিলেন, "রামধন"! তা মরুক্‌গে; মহাশয়, রাম বলিয়া কেহ ছিল না অথচ বইখানার নাম হইয়াছিল "রামায়ণ"। মাথা ছিল না কিন্তু মাথার ব্যথা ছিল। তাওকি কখন হয়?

হরিহর। হয়না কি? এর সব Researches অর্থাৎ অনুসন্ধান হয়ে গিয়েছে। তুমি কি Sir. W. Jones, Prinseps প্রভৃতির কথা মানিতে চাও না?

রামধন। আজ্ঞে তাঁহারা কে জানি না; তবে তাঁহারা কি এত বড় কথাটা বলিয়া গিয়াছেন?

হরিহর। (হাসিয়া) Here it is রামধন, here it is! তুমি যদি ইংরাজি জানিতে তবে বুঝিতে। (এই বলিয়া কতকগুলি

এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণাল সহ ছেঁড়া কাগজ পত্র রামধনের সমক্ষে স্থাপন)।

রামধন। (নিতান্ত পরাভূত চিত্তে) আজ্ঞে সাহেবেরা ;——

হরিহর। কি বল্‌চ বল না? তুমি সাহেবদের কথা মানিতে চাও না? আচ্ছা R. C. Dutt লিখিয়াছেন যে, রামায়ণটা কল্পিত উপন্যাস, এটা প্রত্যয় হয় কি না?

রামধন। আজ্ঞে ও নামটাও যে ইংরাজি হ'ল।

হরিহর। ভাল আপদেই পড়েচি। তিনি যে বাঙ্গালী, এ বুদ্ধিটুকুও নাই? তা যাক্‌; তোমার যদি একটু জ্ঞান থাক্‌তো, তবে Solar Myth এর ব্যাপারটা দিয়া বুঝাইয়া দিতাম যে, রামটাম সব কল্পনা।

রামধন। (স্বগতঃ) এ সংসারে এত রঙ্গও আছে; এদের কথা দু চারিটি শুনিতে

বড়ই কৌতূহল হইতেছে বটে। (প্রকাশ্যে) সে আবার কি?

হরিহর। বল্‌ছি দাঁড়াও; সূর্য্য সম্বন্ধীয় বা সূর্য্য বিষয়ক ইহার কি একটা এক কথার পদ আছে; স্মরণ করিয়া লই।

রামধন। সৌর?

হরিহর। হাঁ হাঁ—Solar Myth কে সৌর পুরাণ বলা যাইতে পারে।

রামধন। ইংরাজিতেও পুরাণ আছে নাকি?

হরিহর। তা নাই; তবে ঐ পুরাণটার নূতন আবিষ্কার হইয়াছে!

রামধন। যদি ছিল না, তবে আবিষ্কার হইল কি প্রকারে? তবে নূতন করিয়া বিলাতে সকলে পুরাণ মানিতে বসিয়াছেন বলুন।

হরিহর। তুমি অত আগ বাড়াইয়া

কথা কও কেন? সৌর পুরাণ কিছু ছিল, তা নয়; এখন কেহ নূতন পুরাণ মানিতেছে তাও নয়, তবে ঐ পুরাণের কথা দ্বারা অনেক প্রাচীন কুসংস্কার ধরা পড়িতেছে।

রামধন। সৌর পুরাণ ছিলও না, নূতন সৃষ্টিও হয় নাই; অথচ সেই সৌর পুরাণ, কুসংস্কার তিরোহিত করিতেছে? আপনি বলিয়া যান, আমি শুনি।

হরিহর। নাহে রামধন ওটা কি বুল্‌ব ছাই, একটা Theory অর্থাৎ মত—তা যাক্; আমি তোমাকে মোদ্দাটা বলিতেছি। Max Muller বা মোক্ষমুলর বুঝাইয়াছেন যে, সকল দেশেই সূর্য্য লইয়া গোড়ায় দেবতা গড়িয়াছে। ধাতুর অর্থে সেগুলি ধরা পড়ে; যথা "দিবস ও ঊষস্" একই ধাতু মূলক। সুতরাং অহন্ শব্দের "অহ" ধাতুর অর্থ ঊষ শব্দ মূলক। সেই অহ, আবার দেখ, গ্রীক্

Daphne অর্থাৎ Dawn অর্থাৎ উষা শব্দের ঠিক অনুরূপ। আবার—

রামধন। মহাশয় কিঞ্চিৎ স্থির হউন। আপনার সেই ইংরাজি পণ্ডিতটীর সংস্কৃত জ্ঞানে কিঞ্চিৎ গোল আছে দেখিতেছি। অহন্ শব্দ ও উষা শব্দ এক ধাতু মূলক কখনই নহে। ইংরাজির কথা লইয়া আপনারা যথেচ্ছা ব্যবহার করুন; কিন্তু সংস্কৃত ভাষাটা আমরা যতদূর জানি, তাহাতে ওটা সিদ্ধ হইতেছে না।

হরিহর। (কিঞ্চিৎ গোলে পড়িয়া) তা নাই বা হোক্; কিন্তু সূর্য্য দেখিয়া যে সর্ব্ব ধর্ম্মের উৎপত্তি, ইহার আর ভুল নাই। তাহা তুমি বুঝিতে পার?

রামধন। সে বিদ্যা আমার নাই—আপনি বলিতে থাকুন।

হরিহর। সূর্য্য পূর্ব্বে উদিত হইয়া

পশ্চিমে অস্ত যান ; অন্ধকার তাঁহার আলোক হরণ করে ; এই সকল দেখিয়া সূর্য্যবংশ, সূর্য্য-বংশের রাজা, রাক্ষস কর্ত্তৃক তাহার সুন্দরী পত্নীর হরণ, ইত্যাদি কথার সৃষ্টি হইয়াছে। হোমরের ইলিয়দেরও এইরূপ উৎপত্তি।

রামধন। (স্বগতঃ) লোকটা ক্ষেপিয়া না যায়। (প্রকাশ্যে) এ কথার প্রমাণ কি ?

হরিহর। কেন ঐত বলিতেছিলাম যে, সমগ্র দেবতাদিগের নাম সূর্য্য শব্দ মূলক।

রামধন। তাত, বলিতে পারেন না ; সূর্য্য হিন্দুদিগের দেবতা বটে ; কিন্তু অন্য দেবতার গায়ে "সূর্য্য" নামের গন্ধও নাই। এ আপনার ইংরাজী নয়, সংস্কৃত। এখানে আপনার কথা মানিতে প্রস্তুত হইব না।

হরিহর। যিনি বেদের বঙ্গানুবাদ করিতে পারেন, তাঁহার কথা মানিবে কি না ?

রামধন। কোন সংস্কৃতজ্ঞ এরূপ বলিতে পারেন না।

হরিহর। (একটু চটিয়া) রামধন, তুমি অর্ব্বাচীন, তুমি মূর্খ, তুমি মোক্ষমুলর মান না, R. C. Dutt মান না?

রামধন! আজ্ঞে এঁরাত হালের মানুষ, আপনি যে প্রাচীন বাল্মীকিকে মানেন না? সংস্কৃত অনভিজ্ঞের সংস্কৃত ধাতুর ব্যাখ্যা না মানা সহজ, না, এত কালের রামায়ণখানা না মানা সহজ?

হরিহর। (অত্যন্ত চটিয়া) রামধন, তুমি দূর হও; সত্যের অবমাননাকারীর মুখ দেখিলেও পাপ আছে।

রামধন। আজ্ঞে ঠিক বোলেছেন; সে কথা মনে পড়িলে আরও দু দণ্ড পূর্ব্বেই বিদায় হইতাম। (প্রস্থান)

নেপথ্যস্থিত শ্রোতা।

(নব্যভারত শ্রাবণ ১২৯৭)—আষাঢ় ১২৯৭

মূষিক দুর্নীতি বিচার

বা

ডিনর বক্তৃতা।

একদিন নিদাঘ মধ্যাহ্নে, যখন আহারান্তে গৃহকর্ত্তা আপিসগত, গৃহিণী বিশ্রামসুখরত, সকলেই যে যাহার মনে এক এক কোণে শায়িত বা পতিত; তখন সেই গৃহস্থের রন্ধনশালার বিস্তৃত বারান্দায়, নির্জ্জনতার সুবিধা পাইয়া, একে একে পাড়ার যত বিড়াল আসিয়া জুটিল। পরিত্যক্ত অন্ন ও কাঁটা বিস্তর ছড়ান ছিল, সুতরাং পরস্পরের কোন বিবাদের কারণ ছিল না। ভ্রাতৃভাবে শাদা, কাল, কটা সকলে মিলিয়া আহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। মোদ্দা কথা সেদিন বিড়াল মণ্ডলীর বিরাট সভা। সভা জিনিসটা মনুষ্যজাতির একচেটিয়া নহে;

তাহা হইলে ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুলের কথা মিথ্যা হইত, এবং বিষ্ণুশর্ম্মা ও ঈষপ্ নির্ব্বাসিত হইতেন।

বিড়াল জাতি বাহু বলে বা থাবা বলে মূষিক সম্প্রদায়ের শাসনকর্ত্তা; শাম, দান, ভেদ, দণ্ডনীতিতে তাহাদিগকে এতাবৎ কাল শাসন করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু অল্পদিন পূর্ব্বে কতকগুলি দুর্ভিক্ষ পীড়িত ইঁদুর আহার প্রার্থনা করায়, মূষিক জাতির স্বভাবের বিষয়ে অনুসন্ধান কমিটি বসিয়াছিল, সেই কমিটি তাঁহাদিগের অনুসন্ধানের ফল এই বিরাট সভার গোচর করিবেন। এবং মূষিক-শাসন বিষয়ে নূতন বিধি নির্দ্ধারিত হইবে। প্রথমে এক আহাম্মকের পোষা বিড়াল, নাম কেহ বলে বেক, কেহ বলে ভেক, বলিলেন যে, তিনি প্রতিপালক শাদা আহাম্মক-মূষিক-মুখে অবগত হইয়াছেন, যে মূষিক জাতি বিড়াল

বর্গের অনিষ্টসাধনে দন্ত বদ্ধ। শিবের প্রসাদ ভোগী মূষিকরাজও এ বিষয়ে সাক্ষী আছেন। এই কথা শুনিয়া একটী রাঙা বিড়াল, যাঁহার গলার আওয়াজ বা "কল" বীণার মত বলিয়া নাম হইয়াছিল "কলবীণ," গুম্ফ বিস্তার করিয়া কহিলেন, "কাল বিড়াল বেক মহাশয় যাহা বলিয়াছেন আমিও তাহা অবগত আছি। আরো শুনুন "হুমো" নামক একটা শাদা বিড়াল, মূষিক জাতির সহিত যোগদান করিয়াছে। (সভাস্থ সকলে, "লজ্জা লজ্জা")।

অতঃপর সভাপতি——যিনি জলে ডুব দিয়া মৎস্য ধরিতে পারিতেন বলিয়া, নাম হইয়াছিল "ডুবুরী", কিন্তু বিড়াল জাতির অনুনাসিক উচ্চারণের ফলে বিড়ালেরা বলিত "ডুবুরিণ",—দাঁড়াইয়া বলিলেন;—"যাহা জানা গিয়াছে তাহাই যথেষ্ট। মূষিক জাতি যে খাদ্য প্রার্থনা করে সেটা তাহাদের ভুল। যতটুকু

আহার পাইলে তাহাদের পুষ্টি, বিড়ালজাতির ভোজনসুখ উৎপাদন করিতে পারে, তত টুকুর অধিক দেওয়া কখন উচিত নয়। সে দিন কলিকাতার নর্দ্দামায় কতকগুলি হৃষ্টপুষ্ট ইঁদুর দেখিয়া আমি শঙ্কিত হইয়াছিলাম। এমন কি, সে দিন কয়েকটী আমার ঘরে ঢুকিয়া যে জ্বালাতন করিয়াছিল, কি বলিব! আমি তাহাদিগকে বিড়াল জাতির পুষ্টিরূপ পোষাক পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা মানে নাই। আমি আর একবার একটা এডিটার ইঁদুরকে নিজ কক্ষে বসিয়া কষিয়া ধমক দিয়াছিলাম, কিন্তু সে উল্টাইয়া গালি দিয়া চলিয়া গেল। মূষিকের দুর্ব্বলতাই আমাদের আধিপত্যের মূল কথা। এক ৫৭ সালে নেংটে ইঁদুর গুলিকে আয়ত্ত করিয়াই সমগ্র ইঁদুর জাতি করতলস্থ হইয়াছিল। এক শত বৎসর পরে আর এক

৫৭ সালে কতকগুলি পশ্চিমে পুষ্ট ইঁদুর, আমাদের গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছিল (মেনি বিড়ালীর মূর্চ্ছা)। ভাগ্যে কেহ "মেও" ধরিতে পারে নাই ; তাই শেষে বিড়াল-ভয়ে "নানা" মূষিক নানাদিকে চলিয়া গেল (আনন্দ করতালি ও মেনির মূর্চ্ছা ভঙ্গ)। আর একশত বৎসর যায় যায়, আর এক ৫৭ অদূর ভবিষ্যতে (সকলে, শোন শোন) ; সুতরাং মূষিক জাতিকে অতিরিক্ত আহার দেওয়া যাইবে না (উচ্চ করতালি) ; উপাধি চায় দিতে পারি কিন্তু টাকা লইব। দুষ্পাচ্য ও দুর্চর্ব্য দর্শন বিজ্ঞানের কাঁটা খাইতে দিতে পারি, কিন্তু দেহ পুষ্টির ব্যবস্থা করিব না। নেংটে ইঁদুর গুলি বই কাটিবে কাটুক, কিন্তু নীতি শিক্ষার বন্দোবস্ত চাই। অর্থাৎ তাহারা শাদা, কাল, কটা ও রাঙার ভেদ বিচার না করিয়া, যাহাতে বিড়াল মাত্রে সকলকেই

সেলাম করে, ইহার বিশেষ ব্যবস্থা চাই। এবং আহার না দিয়া কুস্তি করাইয়া বাল্যকাল হইতেই ইহাদিগকে মৃতপ্রায় করিয়া রাখা চাই (অত্যুচ্চ মেওমেও)। সভাপতি উপবেশন করিলেন ; ডিনার ও ডিনার বক্তৃতা শেষ হইল।

সাক্ষী সেন্‌ট এন্‌ড্রু।

(মে—১৮৮৯)

বিদ্যালয়ের নীতিশিক্ষা ও গবর্ণমেণ্ট।

টমসন বাহাদুর যখন বাঙ্গালার তক্ত জলুস করিতেছিলেন, তখন কৃষ্ণনগর, যশোহর ও ঢাকা প্রভৃতি স্থানের বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে লইয়া কয়েকটী মোকদ্দমা হয়। তাহাতে অনেক গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের চিহ্নিত মহাত্মারা বালকদিগের উপর বড়ই চটিয়া যান। স্বয়ং ছোট লাট টমসন বাহাদুর, কলি-

কাতা সিটিবিদ্যালয়ের গৃহপ্রতিষ্ঠা সভায় যখন প্রবেশ করেন, তখন ছাত্রেরা নাকি তাঁহাকে করতালী দিয়া অভ্যর্থনা করে নাই ; আর বড়লাট রিপণ বাহাদুর পৌঁছছিতে না পৌঁছছিতে করতালীর বজ্রনিনাদ হইয়াছিল। তাহাতে ছোটলাট একটু খানি মুখ ভারি করেন। ইহা ছাড়া মফঃস্বলের অনেক রাঙ্গা হুজুর হাটে বাটে মাটে ঘাটে পরিভ্রমণের সময় বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সেলাম বহুৎ বহুৎ কার্য্যনশ্বাগে প্রাপ্ত হন নাই, ইহাও শুনিতে পাওয়া যায়। গয়াক্ষেত্রে এক দিন পিণ্ড না পড়িলে গয়াসুর মাথা তোলেন, মা মনসার দুধ কলার বরাদ্দ না হওয়াতে "বেহুলা কেঁদে রাঁড় হ'ল ;" পূজ্য পূজকের সম্বন্ধে এমন বাঁধাবাঁধি থাকিতেও এত বিভ্রাট কেন ঘটিয়াছিল, বুঝি না। হাজার হইলেও গয়াক্ষেত্রে আমাদেরই পিতৃপুরুষের ভূত ;

মা মনসা আমাদেরই ঘরের ঠাকুর ; তাঁহাদিগকে বরং একদিন চটান যায়, কিন্তু যে দেবতাদিগের সঙ্গে এক সূর্য্যে ধান ভানিয়া খাইবার সম্পর্কটাও নাই, তাঁহাদিগকে এমন করিয়া ঘাঁটানটা ভাল কি? কাজটা বড় ভাল হয় নাই। এক বৎসর ধরিয়া প্রথমে কাণাঘুসা চলিল, তাহার পর সহসা একদিন লাটের সভায় স্থির হইয়া গেল যে, বিদ্যালয়ের ছাত্রগুলি বড় দুর্বিনীত। নীতিহীনতার পরিচয় আরও দেখা গিয়াছে; রাজপুত্রের অভ্যর্থনায় ছোটলাট বেলী, কেলির পক্ষে, বাইনাচের দিকে, বাজীপোড়ানের অনুকূলে; আর চেঙ্গড়া ছেলেগুলি কুষ্ঠরোগীদিগকে দুটী পয়সা দিতে চায়। আর সহ্য হইল না, বালকদিগকে নীতিপরায়ণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। নীতিশিক্ষার গ্রন্থও রচিত হইয়াছে; The Govern-

ment of India নামে এক খানি পুস্তকও বুঝি এই উদ্দেশ্যে।

যে কারণেই হউক, সরকার বাহাদুর যে নীতিশিক্ষার পক্ষপাতী হইয়াছেন, এটা শুভ লক্ষণ। শারীরিক শিক্ষা, মানসিক শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা, এ সকলি চাই, নহিলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না, শিক্ষা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ থাকে, একথা সকলেই মানে। কিন্তু এতদিন দেশীয় লোকের ধর্ম্মের উপর পাছে হাত দেওয়া হয়, এই আশঙ্কায় নীতিশিক্ষার বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট উদাসীন ছিলেন; এখন কিন্তু বেশ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। বড় গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহের নামে চিঠি জারি হয় যে, বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অবাধ্য, দুর্বিনীত, বে-আড়া; ইহার কারণ অনুসন্ধান করা চাই এবং প্রতিকারের ঔষধির ব্যবস্থাও করা চাই। লাট সভার নির্দ্ধারণে এ কথা

কয়টী এইরূপ আছে ঃ—"In the letter addressed by the Home department to Local Governments and Administrations, their attention was drawn to the growth of tendencies unfavourable to discipline and favourable to irreverence in the rising generation in India". প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টসমূহ, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, পরিদর্শক প্রভৃতি মান্যগণ্য দশজনের মত জানিয়া পাঠান। এই সকল মত সংগৃহীত হওয়ার পর বড় লাটের নির্দ্ধারণ সহ সেগুলি এক সঙ্গে ২৫৫ পৃষ্ঠার একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়া দুটাকা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। এগ্রন্থে দেখিবার ও শিখিবার অনেক কথা আছে। এদেশে যাঁহারা শিক্ষাকার্য্যের সহিত সংসৃষ্ট, যাঁহারা বাস্তবিকই দশজনের মধ্যে একজন, এরূপ অনেক ব্যক্তির মত এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। তাঁহাদিগের মত ও

অভিপ্রায়ে নূতনত্ব বড় একটা থাকুক আর নাই থাকুক, খুব বৈচিত্র্য আছে।

বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগের পরিচালক শ্রীমান ক্রফট্ ও মান্দ্রাজের সরকারী বড় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীমান ডানকান, যাহা বলিয়াছেন, এ প্রকাণ্ড গ্রন্থের মধ্যে তাহাই খুব আলোচনার যোগ্য। বালকদিগের দুর্বিনয় রোগের কারণ সম্বন্ধে ডানকান (Duncan) যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি সার কথা। ডানকান বলেন যে, এ রোগ যে কেবল ভারতবর্ষীয় বালকদিগকেই আক্রমণ করিয়াছে, তাহা নহে। এ সংক্রামক রোগ সমগ্র সভ্য পৃথিবীময় ছড়াইয়াছে। যাহা কালের লক্ষণ, কালের ধর্ম্ম, কালের গতি, তাহা ভারতবর্ষেও দেখা দিয়াছে, তাহার বিচিত্র কি? এ যুগের দর্শন, বিজ্ঞান, প্রাচীন কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করি-

তেছে; সুতরাং নব্য শিক্ষিতেরা প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাহীন; কোন কথায় আর পীর পয়গম্বর মানে না, দোহাই মানে না। কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি, সকল বিভাগেই গুরুতর বিপ্লব চলিতেছে। ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী একটী বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, নূতন শিক্ষাপদ্ধতি, বিচারপদ্ধতি প্রভৃতি ধীরে ধীরে হিন্দুজাতির চিত্তে এক বিপুল পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে; ইংরাজের ধর্ম্মাধিকরণে ব্রাহ্মণ শূদ্রে, রাজা প্রজায় প্রভেদ নাই; ইংরাজী পাঠশালায় প্রাচীন সংস্কারের নীচ জাতীয় বালক উচ্চ জাতীয় বালককে পরাভূত করিয়া সম্মান লাভ করিতেছে; সুতরাং নূতন ভাব-তরঙ্গের অভিঘাতে চারিদিকে উচ্ছৃঙ্খলতা খুব দেখা দিয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, এই উচ্ছৃ-

খলতা নিবারণ করিয়া যিনি প্রাচীন প্রথার মধ্যে এই যুগের যুবকদিগের মাথা গুঁজিয়া দিতে চান, তিনি প্রবাহমান গঙ্গার স্রোত বামহস্তে ঠেলিয়া গোমুখীর ক্ষুদ্র গর্ভে পূরিবার অভিলাষী। বালকেরা শাস্ত্র মানে না, দোহাই মানে না; বিচার করিয়া আপনার পথ আপনি দেখিয়া লইতে চায়, এসকল কুলক্ষণ নহে, সুলক্ষণ। তবে ইহার সঙ্গে সঙ্গে যে স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা চলিয়াছে, বিচারের নামে দুর্বিনয় স্থান পাইতেছে, তাহার অবশ্যই প্রতিকার চাই। আসল কথা এই, স্বাধীন ভাব বিনষ্ট করিতে না দিয়া বরং যাহাতে স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার হয়, এরূপ শিক্ষা চাই। উচ্ছৃঙ্খল বালকদিগের চিত্ত নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র নেতা চাই। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়, সুসংস্কৃত

বিজ্ঞানানুমোদিত নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, বালকদিগকে নিয়মিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; এবং এবিষয়ে তাঁহার কৃত-কার্য্যতা কতদূর, তাহা, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ছাত্রসভার যাঁহারা খবর রাখেন, তাঁহারা বিশেষ সাক্ষ্য দিতে পারেন। ব্রাহ্মদিগের এই সাধু উদ্যমের কথা ক্রফট্ বাহাদুর স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তিনি বলেন যে, ব্রাহ্মদিগের প্রভাব বালকদিগের উপর খুব বহু বিস্তৃত নহে। এখন দেখা যাউক, গভর্ণমেণ্ট এই নীতি শিক্ষার ভার লইতে গিয়া যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে ফলবত্তার আশা কত দূর।

একথা বিচারের পূর্ব্বে, ক্রফট্ মহোদয়ের অভিপ্রায় হইতে দুই একটী কথা তুলিব। ক্রফট্, বহরমপুর বিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের

সারগর্ভ কথা গুলিতে সায় দিয়া, সেই গুলি তুলিয়া বলিয়াছিলেন যে, এদেশের গৃহ সুসংস্কৃত না হইলে বালকদিগকে সুনীতি-পরায়ণ করিবার চেষ্টা দুরাশা মাত্র। যে গৃহের পিতামাতার শিক্ষা, রুচি ও মতের প্রতি সন্তানেরা শ্রদ্ধাহীন, সে সংসারের বালকেরা যে বিদ্যালয়ের শিক্ষকের প্রতি বড় একটা শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতে পারিবে, এ আশা নাই। যেখানে শ্রদ্ধা ভক্তির প্রকৃত শিক্ষাস্থল, সেখানে যদি তাহা না হয়, তবে বাহিরে হইবে কি প্রকারে? আরও কথা আছে; ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে উচ্চ উচ্চ মত শিক্ষা করে, কিন্তু গৃহে সমাজের খাতিরে সে গুলি চাপিয়া রাখিয়া, যাহা মানে না, তাহারই বাধ্যতা স্বীকার করে। এইরূপে গভীর কপটতায় চরিত্রের গ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়ে; সুতরাং

তাহারা নিজে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়া আরও দশজনকে দুর্নীতি-পরায়ণ করিয়া তুলে। কোন্ স্থলে পৃথিবী টলিয়া গেলেও আত্ম-বিশ্বাসের আদর ও সম্মান করিতে হইবে, এবং কোন্ স্থলে প্রাণপাত করিয়াও বাধ্য হইয়া চলিতে হইবে, তাহা বড় লোকে বিবেচনা করিয়া দেখিতেছে না; সুতরাং ইহাদের স্বাধীন মন্ত্রে একে আর ফল হইতেছে।" একথাও ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণ অনেকবার বলিয়া বলিয়া শ্রান্ত হইয়াছেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কিছু গৃহ-সংস্কার করিতে পারিবেন না। তবে বিদ্যালয়ের বালক-দিগকে সৎসাহসে অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা পাইতে পারেন। অবশ্যই ইহা নীতি-শিক্ষার একটা প্রধান কথা।

এখন প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে ক্রফটের অভিপ্রায়টা বলি।

ক্রফট্ বলেন যে, যদি বিদ্যালয়ে নীতি-শিক্ষা দিবার প্রয়োজন হয়, তবে ভাল শিক্ষক নিযুক্ত করা চাই। কিন্তু অল্প টাকায় যে ভাল শিক্ষক পাওয়া দুরূহ, সে কথা ক্রফট্ স্বীকার করিয়াও সে সম্বন্ধে আর কথা তুলেন নাই। টাকা খরচ করিতে ক্রফট্ রাজি নহেন; গবর্ণমেণ্টও বলেন যে, ক্রফটের কথা খুব ঠিক। বিদ্যালয়ের জন্য অতিরিক্ত টাকা খরচ অপব্যয়; অথচ ভাল শিক্ষকও চাই!! কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, দিনে দিনে ব্রাহ্মণের গোরুর কিছু অপ্রতুল হইতেছে; টাকার অভাবে অনেক সুযোগ্য শিক্ষকই শিক্ষকতা ছাড়িয়া অন্য বিভাগে যাইতেছেন; কেবল যাঁহাদের অন্য কোথাও পয়সা হয় না, তাঁহারাই এ বিভাগ উজ্জ্বল করিতেছেন! ভাল শিক্ষকের কথা এই পর্য্যন্ত। তার পর ক্রফট্ বলেন

যে, নীতিশিক্ষা বলিয়া নীতিশিক্ষা দিতে গেলে শিক্ষাটা তিক্ত হইয়া উঠিবে, কিছু ফল হইবে না। এ কথা আমরাও মানি। ওরূপ করিলে নীতিশিক্ষার শ্রেণী, ঠিক পাদরী বিদ্যালয়ের বাইবল শ্রেণীর মত তামাসার জিনিষ হইয়া দাঁড়াইবে। ক্রফটের মতে আমরা সায় দিয়া বলি যে, পড়িবার গ্রন্থই এরূপ স্থির করা উচিত, যাহাতে পরোক্ষ-ভাবে বালকদিগের হৃদয় সাধুতার দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু এরূপ পুস্তক নির্ব্বাচন বড় সহজ নহে। এই অভিপ্রায়ে "Golden Deeds" প্রবেশিকার পাঠ্য করা হইয়াছিল; কিন্তু সে গ্রন্থে যেরূপ খ্রীষ্টানী গোঁড়ামী, এবং অযথা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে ফল উল্টা দাঁড়াইতে পারে। যাহা হউক, মানিয়া লওয়া গেল যে, ভাল পুস্তক নির্ব্বাচিত

হইবে; কিন্তু সর্ব্বত্র শিক্ষা দিবার শিক্ষক কই? টাকা না দিলে ভাল লোক হয় না; গভর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে সংযত-হস্ত, তবে উপায় কি? সুতরাং দেখিতে পাইতেছি যে, গভর্ণমেণ্টের এত আয়োজন, এত বাক্য, কালি কলম এবং কাগজ ব্যয়, যেন একটু বৃথা হইবার দিকে চলিল! সুধু অনাহারে শীর্ণ শরীরে কুস্তি করিয়া, এবং নির্ব্বাচিত গ্রন্থ পড়িয়াই বালকেরা যদি ভাল হইয়া যায়, ভাল কথা, কিন্তু তাহার আশা আছে কি?

(নব্যভারত জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭) (চৈত্র ১২৯৬)

গণশঙ্কের যুদ্ধ।

১৭৫৭ শাল হইতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বৃটিসসিংহ, ভারত-গিরিরাজ শৃঙ্গে বসিয়া, ব্রহ্মাদি করি-রাজকুম্ভ ভেদ করিতেছিলেন;

পবনাতিরেক বেগে, লৌহবর্ত্মে ছুটিতে-ছিলেন ; চীন, তাতার, তিব্বত ও আফগানি-স্থানের "সাভসিশৈলকুঞ্জে," তাঁহার গর্ব্ববিজৃম্ভিত তেজোদ্দীপ্ত গর্জ্জনধ্বনি নিনাদিত হইতেছিল ; কিন্তু হায় ! তথাপি, সিংহ নাকি পশুরেব নান্যঃ. তাই, সহসা সেদিন ঠিক দুপুর বেলায়, বাঙ্গলার পাতকুয়ায় পড়িয়া সিংহরাজ পপাত চ মমারচ। বাঙ্গলার টিকিধারী অনাহারী বেকারী লোকগুলিকে শৃগালই বল, আর শশকই বল, তাঁহারা এখন আর বড় ঐকটা কেওকেটা নন ; কথাইত আছে "বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।" সিংহরাজের এত দর্প ক্ষয়, পরাজয় ও কূপে লয়প্রাপ্ত হইবার নিত্যনৈমিত্তিক সমবায় ও অসমবায় কারণ, একটি ক্ষুদ্র অঙ্কের ভুল। বৃটিশসিংহ গর্জ্জিয়া বলিলেন যে, দশ বৎসরের সহিত যৎসামান্য দুই বৎসর যোগ করিলেই, স্ত্রীলো-

কের বয়স বার বৎসর হয়। অঙ্কশাস্ত্রের এই অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য দেখিয়া বাঙ্গলার শশক চূড়ামণি প্রমুখ বিবিধ "বিধির সৃষ্ট" গণ, ইষ্টনাশ ভয়ে জঞ্জাল বাধাইয়া তুলিল। নিউটন আগে না লীলাবতী আগে? হার্সেল বড় না আর্য্যভট্ট বড়? বঙ্গদেশে এ গণনা উপেক্ষিত হইল। তাহারা শাস্ত্র খুলিয়া প্রমাণ করিয়া দেখাইল যে, ১০ বৎসরের অধিক স্ত্রীলোকের বয়সই নাই। দশাতিরিক্তেই দশম দশা; পৌত্রমুখাবলোকনান্তর বৈতরিণীর আশা। অত্র শাস্ত্রীয় প্রমাণং যথা, "রাইয়ের দশম দশা, ও দশা দেখে যারে দূতী।" প্রমাণের অপ্রমেয় প্রতাপে, "ভীত চকিত স্তম্ভিত" সিংহের নাশা ফুলিল, কেশর দুলিল। এ চিহ্ন সিংহের ভীতিজনিত কিম্বা অন্য কিছু, সেটা মীমাংসা করিতে না পারিয়া দলপতি, শশক, স্বয়ং

মুক্তকচ্ছ, ঊর্দ্ধপুচ্ছ এবং উত্থিত শীর্ষ-কেশগুচ্ছ হইয়া, সকলকে গৃহংগচ্ছ বলিতেছিলেন। কিন্তু বনগাঁয়ের শেয়াল রাজা অবিলম্বে মাভৈঃ মাভৈঃ বলিয়া দলবলে গড়ের মাঠ আক্রমণ করিলেন, অমনি—

ভয়েতে সিংহের বাছাটা ঝুপ্ করে কূপে
পড়িলেন মরিলেন শেষে এইরূপে।

(ফতে, রোজ—১৯ মার্চ্চ ১৮৯১)

বিকল্প।

"There lives more faith in honest doubt,
Believe me, than in half the creeds."

—*Tennyson.*

বিকল্প।

প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ।

স্বাস্থ্যরক্ষা শাস্ত্রে যাহাই বলুক, প্রত্যূষের নিদ্রাটুকুর মত তৃপ্তিদায়ক জিনিস, এই দুঃখের সংসারে বড়ই বিরল। সাগর পাড়ি দিয়া, কূলে আসিয়া সাগরের সৌন্দর্য্য দেখার মত; সেতারে রাগিণী আলাপের পর, গতের ঝঙ্কারের মত; অতি ভোজনের পর, একটু "রসনার রস" চাট্‌নি চাটিবার মত; এবং মাতালেরা বলিতে পারেন যে, অতিমাত্রায় নেশা করিবার পর, একটু খোঁয়ারী ভাঙ্গার মত; এই প্রত্যূষের নিদ্রায় অনেক সুখ। আর স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ? যাহারা নিত্যসুস্থ, অথবা যাহারা স্বাস্থ্যেরই প্রতিমূর্ত্তি, সেই বিদ্যালয়ের শিশুছাত্র ভিন্ন শোনে কে? এ কথায় কেহ হয় ত টেনিসনের বচন তুলিয়া বলিবেন,

"Cursed be the sickly forms that err from honest Nature's rule." যাহাই বল বাপু, অভিধানের বোঝা ঘাড়ে করিয়া সাহিত্য চর্চ্চা ; আর স্বাস্থ্যরক্ষার গ্রন্থ কুক্ষিগত করিয়া "প্রবৃত্তি কুত্র কর্ত্তব্যা"র অনুসন্ধান ; আমা হইতে হইবে না ; তবে যিনি ত্রেতায় সূর্য্যকে কুক্ষিগত করিয়া, রাত্রি বাড়াইয়া ছিলেন, তাঁহার পবিত্র বংশোদ্ভব মহাত্মারা, পারিলে পারিতে পারেন। দোহাই ডার্বিন্ সাহেব, আমি সেই গৌরবান্বিত দলভুক্ত নহি।

কিন্তু আমার প্রত্যূষ নিদ্রার অনেক ব্যাঘাত। আমার এই সুখের পথে অনেক কণ্টক। বিধাতা! শোভার শোভা, রূপের রূপ অত্যুজ্জ্বল চন্দ্রতারকা তোমার যে অঙ্গুলীর সৃষ্টি, এই কর্কশ কণ্ঠ, কদাকার, কুরূপ, কৃষ্ণকায় কাক জাতি কি সেই অঙ্গুলী

গঠিত ? তোমার পরম রমণীয় বিহঙ্গ-জগতে এত কলকণ্ঠ, এত চিত্রিত বিচিত্রিত পক্ষী থাকিতে, এ কাকের সৃষ্টি কেন ? বাজখাই আওয়াজের ভয়ে আমার এ জীবনে, সঙ্গীত শিক্ষা হইল না, আর আমার "ঘরের চালে পালে পালে" এত বাজখাই ছড়াইয়া দিলে কেন ? পরীক্ষিত সর্পযজ্ঞ করিয়াছিলেন, আমি কাকযজ্ঞ করিব ! আমি কাকের জ্বালায় প্রাণ ভরিয়া প্রত্যুষে নিদ্রা যাইতে পারি না। যে দেশে কাক নাই, সে দেশে কি রাত্রি প্রভাত হয় না ? যেখানে বক্তা নাই, সেখানে কি স্বদেশ-প্রেম জন্মে না ? যেখানে উকীল নাই, সেখানে কি ন্যায় বিচার চলিতে পারে না ? যাহাদের পুরোহিত নাই, তাহাদের কি ধর্ম্মলাভ হয় না ? যে ঘরে পদীর মা নাই, সে ঘরের কি গৃহিণীপনা বন্ধ থাকে ? যাহারা মদ খায়

না, তাহারা কি আমোদ প্রমোদ করে না ? ভারতমাতার বিশ কোটী সন্তান, যদি প্রতিজন এক একটী করিয়া কাক বধ করেন, তবে এ কাককুল অচিরাৎ নির্ম্মূল হয় ; আর আমি, সুখে, এই শরতের প্রভাতে, আনন্দে একটু নিদ্রা যাই ।

রাত্রে এক পস্‌লা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। তাই প্রভাতে, ঈষৎ মাত্রায় শীত বোধ হওয়াতে, বিছানার চাদর খানি তুলিয়া গায় দিয়া, একটু খানি মিঠে রকমের ঘুম ঘুমাইতেছি ; এমন সময় সেই "কা-কা" শব্দ, চৈত্রের রৌদ্রে ঢাকের শব্দ অপেক্ষাও কর্কশ হইয়া কাণে গেল। রাগ করিয়া শয্যা ত্যাগ করিলাম ; দেখি, চারি দিকে কেবল সেই "কা, কা, কা," ! দরজা খুলিয়া দেখি, শরতের জগতে সৌন্দর্য্য যেন আর ধরে না ! কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যে বালাই, সেই

"কা, কা" শব্দ! ভূমির সমান্তরাল রেখায় উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত, "তোয়াবশেষেণ হিমাভমভ্রম্," মেঘ শ্রেণীকে সপ্তবর্ণে চিত্রিত করিয়া ঊষার নবীন রাগ, পূর্ব্বাকাশ অনুরঞ্জিত করিয়াছে। এবং সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল আকাশের প্রতিবিম্ব বুকে ধরিয়া, স্বচ্ছ, সুনীল, বহুদূর প্রসারিত; তরঙ্গান্দোলিত সাগরবারি, সাগরাধিষ্ঠাত্রী দেবীর মণিমাণিক্য খচিত অঞ্চলের মত দুলিতেছে। ভাবিলাম, সেই অতুলনীয়া শোভা, একবার প্রাণ ভরিয়া দেখি! মনে করিলাম, যদি নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছেই, তবে একবার এই প্রত্যক্ষীভূতা মূর্ত্তিমতী কবিতার লাবণ্য সাগরে ঝাঁপ দি! কিন্তু কাকের সেই কর্কশ স্বর; আমার সৌন্দর্য্য অনুধ্যানের বাধা হইল; কবিতার প্রতি উদ্দীপ্ত মধুর প্রেম ভাবে, একটু যেন তিক্ততা আসিয়া পড়িল;

আত্মবিসর্জ্জনের অনুরাগ যেন শিথিল হইয়া পড়িল ; দুর্ম্মুখ আবার ডাকিল "কা ! কা ! কা ।" ! আমি পরাজিত হইয়া মনে মনে কাতর ভাবে কাকের উদ্দেশে বলিলাম, বাপু, তুমি যদি অনুগ্রহ করিয়া ক্ষণকালের জন্য একটু চুপ কর, আগামী নবান্নের সময় তোমাকে প্রাণ ভরিয়া চাউল খাইতে দিব । কাক যেন আমার কাতরতা বুঝিয়া বিদ্রুপ করিয়া আরও চীৎকার করিতে লাগিল ।

যে মানুষ কাকের কাছে পরাজিত হয়, তাহার মূল্য-কি ? বাস্তবিকই এ ছার মনুষ্য জীবনের মূল্য কি ? বহির্জ্জগতে আমার নিদ্রার বিঘ্ন এই কুৎসিৎ কাক, কোলাহল ; এবং অন্তর্জ্জগতে আমার শান্তির বিঘ্ন শত শত কুপ্রবৃত্তির হলাহল ! অসংযত রসনা, প্রতি মুহূর্ত্তে যে বিষ উদ্গীরণ করে, তাহাতে কত বন্ধুর হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়াছে ! কুশাসিত,

দৃষ্টি যেরূপ বক্র গমন করে, তাহাতে কত পবিত্র-স্বভাবা রমণী সে দৃষ্টিকে সর্পের বক্র গমন অপেক্ষাও ভীষণ মনে করিয়া আমাকে দূরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন! আমি প্রতি-নিয়ত হস্ত সঞ্চালনে, কত নির্দ্দোষীর হৃদয়ে আঘাত দিতেছি; আমি প্রতি পাদবিক্ষেপে, কত অবনত-মস্তক দরিদ্রের রুগ্ন শীর্ণ জীর্ণ মস্তক চূর্ণ করিতেছি! আমি প্রতি প্রশ্বাসে যে পাপের ঝড় প্রবাহিত করিতেছি, প্রতি নিঃশ্বাসে তাহার নির্ম্মম ধ্বংস কার্য্যের জন্য, অনুতাপের ব্যথা বুকে পূরিতেছি! আমার শান্তি কই? আমার সুখ কই? অথবা সুখ বুঝি এ সংসারে নাই। তবে আমার প্রত্যূষ নিদ্রায়ই হউক, আর অন্য যে কোন কারণেই হউক, কখন কখন আমরা যাহাকে সুখ বলিয়া বর্ণন করি; তাহারা সুখ নহে, দুঃখকে ঘনীভূত করিবার হেতু মাত্র। দেশী কবি-

তায় আছে ঃ—"দুঃখের সংসারে সুখ, দুঃখ দিতে আসে।" বিদেশী কবি, দান্তেও তাহাই বলিয়াছেন, "No greater grief, than to remember days of joy, when misery is at hand" টেনিসনেও তাহারই ভাষ্য, "A sorrow's crown of sorrow is remembering happier things," যদি সুখ নাই, কেবলি দুঃখ, তবে সেই দুঃখের উপর অল্প একটু দুঃখের মাত্রা চড়াইয়া, এই দুঃখের সংসারকে কদলী প্রদর্শন করায় ক্ষতি কি? মরণে আপত্তি কি? কিন্তু মরিতে এ প্রাণ চায় না। কেন? কারণ অনু-সন্ধান করিয়া দেখি।

ঐ শোন বুদ্ধি আমাকে বলিতেছে, "তুমি বড় দুঃখী, তুমি মর"। প্রাণ, বলি-তেছে "এই আশ্চর্য্য সৃষ্টির মধ্যে পরমাশ্চর্য্য এই মনুষ্য দেহ, আমি কেমন করিয়া ইহাকে

অন্ধকারে ডুবাইয়া দিব ?” বুদ্ধি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল, “দেখ, ঐ প্রজাপতিটি কেমন সুন্দর ! এবং সে যে ফুলটির উপর উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে, সেই জড় ফুলটিও কেমন সুন্দর !” প্রাণ বলিল “সেকি কথা ! মানুষের সঙ্গে কাহার তুলনা সাজে ? জ্ঞান, কর্ম্ম, মাহাত্ম্য, এত কাহার আছে ? মানুষ সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ ! বুদ্ধি বিদ্রুপ করিল ; বলিল, তুমি প্রত্যূষে নিদ্রা যাও, ক্ষতি নাই, কিন্তু এমন শরৎকালটা বহিয়া গেলে, তুমি কি এক দিনও রাত্রিকালে, ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ নাই ? দেখ নাই, কত অনন্ত লোক, তোমার মাথার উপর প্রতিদিন প্রভাসিত হইতেছে, এবং নিবিতেছে ! এই অনন্ত সৃষ্টির তুলনায়, তোমার পৃথিবী রেণুর রেণু ! সেই পৃথিবীতে তুমি কিয়ৎ পরিমাণে বিকশিত, জটিল

স্নায়ু চক্র বিশিষ্ট দেহ পাইয়া, এত বড়াই কর? এই অনন্ত লোকে কত অনন্ত সৃষ্টি আছে, তুমি জান? তোমা অপেক্ষা কত উন্নততর জীব সৃষ্টি রহিয়াছে, তাহার সন্ধান পাইবারও তোমার ক্ষমতা নাই।” কিন্তু প্রাণ নিরস্ত হইবার নহে। সে বলিল, “এ সংসারে কেহই তুচ্ছ নহে; সকলেরই সমান প্রয়োজন। শালগাছ অপেক্ষা একটা শুষ্কতৃণ কম মূল্যবান কে বলিবে? একটিতে এক কার্য্য, অন্যটিতে অন্য কার্য্য সাধিত হয়; একের কার্য্য অন্যে সাধন করিতে পারে না। সুতরাং প্রয়োজনের হিসাবে বিভিন্নতা কই?” এ কথা শুনিয়া, বুদ্ধি যেন একটু খানি নাসিকা উত্তোলন করিয়া, ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিল; “এমন করিয়া প্রবোধ দেওয়া মন্দ নয়! কিন্তু দেখ, এই জগতে হাম্‌বোল্ট মহোদয়ের গণনায়, লুপ্ত এবং স্থিত উদ্ভিদ্‌

এবং প্রাণীর "জাতি" কোটি পরিমিত। প্রতি জাতিতে কত বর্ণ, বর্ণে বর্ণে কত গোত্র, প্রতি গোত্রে কত গোষ্ঠি, গোষ্ঠিতে গোষ্ঠিতে কত পরিবার, এবং প্রত্যেক পরিবারে কতগুলি তুমি এবং আমির সমষ্টি। গণনা এই খানেই শেষ হয় নাই। তোমার এই অতি ক্ষুদ্রতা, একবার সৃষ্টিপুঞ্জের মধ্যে পৃথিবীর যে অতি ক্ষুদ্রতা, তাহার সহিত বিচার করিয়া লও। বল দেখি, "এগণনায় তুমি কোথায়? বাঁচিয়া আছ, না মরিয়াই আছ? যে সৃষ্টিপুঞ্জের মধ্য হইতে তোমার সমগ্র সৌর জগৎখানি পুঁছিয়া ফেলিয়া দিলে, ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, হিসাব নিকাশ নাই, সেখানে তোমার কাতরোক্তি শুনে কে? হে নগণ্য, হে তুচ্ছ, তুমি মর।" প্রাণ যেন ইহার উত্তরে কহিল, "আমি নগণ্য, আমি তুচ্ছ, তাহা মানি! অনন্ত সৃষ্টির

তুলনায়, আমি যাহা; অনন্ত পরমেশ্বরের তুলনায় তুমি যাহাকে অনন্ত সৃষ্টি বলিতেছ, তাহাও তাহাই! সৃষ্টি বলিলেই বুঝিলাম, তাহার আদি আছে, কুল আছে। কাজেই সে যত বড় হইলেও সীমাবদ্ধ। স্রষ্টার করুণাসাগরে সেও এক বিন্দু; এ পৃথিবীর মধ্যে একটা পর্ব্বত, একটা বৃক্ষ অপেক্ষা উচ্চ বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু যদি ঊর্দ্ধে উঠিয়া দেখ, যদি গ্রহান্তর হইতে দৃষ্টিপাত কর, তবে ক্ষুদ্র ও বৃহতে ভেদ বুঝিতে পার কি? হিমাচল ও বালুকা স্তূপ, কণার কণা হইয়া কোথায় মিশাইয়া যায়। সুতরাং স্রষ্টার কাছে আমি এবং এই অসীম সৃষ্টি, সকলেই বিন্দু। আর, যিনি অনন্ত, যিনি স্রষ্টা, তিনি কি ক্ষুদ্র বলিয়া আমার প্রতি উদাসীন? যতদূর শাসন করিতে পারিবে না, ততদূর রাজ্য বাড়াইও না। এই কথা

এক জন সামান্যা স্ত্রী, একজন সম্রাটকে বলিয়াছিলেন। যদি তত্ত্ব লইতে না পারিতেন, তবে কি সেই বিশ্বস্রষ্টা, তোমাকে কিম্বা আমাকে গড়িতেন? আরও শুন, তোমাকে সেই প্রাচীন কালের একটী কথা এই স্থানে বলি। দেখ আমার অন্তরে কত আশা কত স্নেহ! যেন ফুরায় না, ফুরাইতে চাহে না। আমি বিন্দু, কিন্তু ইহাদের এক এক বিন্দু, সিন্ধু অপেক্ষাও বৃহত্তর! আমার আশা এই ক্ষুদ্র জগতের চতুঃসীমায় বদ্ধ নহে। তুমি যাহাকে অনন্ত সৃষ্টি বলিতেছ, তাহাকেও পদতলে দলিয়া এ উড়িতে চায়। এক হিসাবে আমি নগণ্য বটে; কিন্তু অন্য দিক্ দিয়া দেখ, আমার মাহাত্ম্য বড় কম নহে।"

এবার বুদ্ধি রাগ করিল। ভ্রূকুটি করিয়া কহিল; তোমার বড় স্পর্দ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে, দেখিতেছি। তুমি ক্ষুদ্র ও নগণ্য, এ কথা

যেন বুঝিয়াও বুঝিতেছ না। তোমার মনে মনে, অজ্ঞাতে এই কুসংস্কারের বীজ এখনও অঙ্কুরিত আছে যে, এই ক্ষুদ্র পৃথিবী লইয়াই যত সৃষ্টি; এবং সেই সৃষ্টির মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ। তাহা না হইলে, মরণান্তেও তোমার আশা, ঈপ্সিত পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে, এমনটা ভাবিবে কেন? দেখ, তুমি এইমাত্র যে কাক জাতির উপর রাগ করিয়াছিলে, সে কাক জাতির পরিণামের কথা ত তুমি একবারও ভাব না? পশু পক্ষী-কীট পতঙ্গাদির আশা ভরসা, যদি তাহাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইতে পারে, এমনটা ভাবিতে পার, তবে তোমার নিজের বেলায় এতটা বাড়াবাড়ি কর কেন? তোমা অপেক্ষা সহস্র গুণে উন্নততর জীব, এ সৃষ্টিতে থাকিতে পারে। অথবা তোমাদেরই ক্রমবিকাশে, ভবিষ্যতে.

শ্রেষ্ঠতর মনুষ্যের সৃষ্টি হইবে। তুমি এই ক্ষুদ্র কাক বেচারীকে যে চক্ষে দেখিতেছ, তাহাদের দৃষ্টিতে, তুমি, তাহা অপেক্ষা আর কি বড় একটা কিছু? তোমার আশাই যদি অনন্তে ছুটিয়া যায়, তবে তাহাদের আশা কত দূর প্রসারিত হইবে? অনন্তের পর তো আর স্থান নাই? অত আত্মশ্লাঘায় কাজ নাই, তুমি মর।

এ কথা শুনিয়া প্রাণ যেন একটু বর্দ্ধিত তেজে, অধিকতর অনুরাগে কহিতে লাগিলঃ- "কাকের আশা, কাকের ভরসা কাক জানে। তুমি কিম্বা আমি তাহার প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে কথা কখনও বুঝিতে পারিব না। তবে সে কথায় তোমার আমার কাজ কি? আর তুমি যে উন্নততর জীবের কথা বলিতেছ, আমি তাহাতে অবিশ্বাস করিতেছি না। কিন্তু উন্নতের আশাও

উন্নততর হইবে, এইরূপ বুঝি। 'আমি যে তৃপ্তির জন্য লালায়িত, আমি যে অনন্তের ভিখারী, তাহা হয়ত তাহার কাছে বড় ক্ষুদ্র। সুতরাং আমি যাহা চাই, তাহা আমার বিবে-চনায় শেষ হইলেও, উন্নততর প্রাণের কাছে শেষ বলিয়া গণিত হইবে না। তুমি আমাকে নগণ্য বলিতেছ, অথচ এই নগণ্যের ক্ষুদ্র আশা ও কল্পনা লইয়া মহতের বুকে পূরিয়া দিতে চাও কেন? কাকের কাম্য কাকের কাছে, আমার কাম্য আমার কাছে; আর উন্নততরের কাম্যও তাহারই কাছে। সক-লেরই আশার পরিতৃপ্তি হইবে। নচেৎ আশার উদয় হয় কেন? কিছুই যখন উদ্দেশ্য-বিহীন নয়, তখন আমার ক্ষুদ্র আশা বেচারী মাঠে মারা যায় কেন?

দূর হউক ছাই! ভাবিতে ভাবিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি! আমার

সেই প্রভাতের সপ্তবর্ণ-চিত্রিত মেঘ কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। সে অরুণ জ্যোতি নাই, সে স্নিগ্ধ সমীরণ নাই; সতেজ শ্যামল পত্রে, জলবিন্দু সম্পাতের সৌন্দর্য্য নাই। কাকের সেই দিক্‌ব্যাপী কর্কশ কণ্ঠও নাই। সূর্য্যের প্রদীপ্ত কিরণ, স্নিগ্ধপত্রে প্রতিফলিত হইতেছে; আকাশ আলোকে ভাস্বর; পৃথিবী কর্ম্ম কোলাহলে উদ্দীপ্ত! আর কাকগুলি? তাহারা এখন অতি দূরে বা অনতিদূরে, একটু নরম সুরে "কা কা" করিতেছে! কিন্তু এই ভাবনায় বুঝি আমার একটু উপকার সাধিত হইয়াছে। সেই কাকের স্বর, সেই সূর্য্যের আলোক, সেই আকাশের মহিমা, পৃথিবীর সেই কর্ম্মময় উৎসাহ, এবং বৃক্ষের সেই উজ্জ্বল রূপ, সকলি যেন এক সঙ্গে, একই সঙ্গীতের বিভিন্ন স্বর হইয়া, আমার হৃদয়তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিল! আমি যে

দুরন্ত বাসনার বাধার কথা বলিতেছিলাম, তাহারা আমার তন্ত্রীর সা, ঋ, গা, মা প্রভৃতির পরদা সাজিয়া দাঁড়াইল। আমি তখন দেখিলাম জগতের আদি অন্ত মধ্য কোথাও ক্লেশ নাই, দুঃখ নাই, দুর্গতি নাই। অনন্ত লোক হইতে যেন একই শান্তির গীতি উত্থিত হইতেছে! আমি আশ্বস্ত হইলাম। বুঝিলাম আর কাকের ডাকে আমার অনিষ্ট হইবে না। অদ্য হইতে আমার প্রত্যূষ নিদ্রার পথ নিষ্কণ্টক হইল।

সায়াহ্ন প্রলাপ।

যে কার্য্যে আমার হাত নাই বা ছিল না, তাহার ভালমন্দের জন্য আমার চিন্তা কি? আমি ইচ্ছা করিয়া জন্মগ্রহণ করি নাই, আমার নিজের জন্মের উপর আমার তিলমাত্রও আধিপত্য ছিল না, তথাপি আমার এ জীবন

কেন, লইয়া কি করিব, ইত্যাদি ভাবনায়
শিরঃপীড়া উৎপাদন করি কেন? কেন তাহা ত
জানি না, কিন্তু বিশেষ করিয়া বুঝিয়াছি যে,
জীবন থাকিতে এ চিন্তা দূর হইবার নয়।
প্রথম ভাবিতাম, এ জীবন আহার করিবার
জন্য। কিন্তু যখন দেখিলাম প্রতি ছয় ঘণ্টায়
একবার বই পেট পুরিয়া খাইতে পারা যায়
না; প্রতি ত্রিশ দিনে ৭। ৮ দিনের অধিক
নিমন্ত্রণ জুটে না; তখন আর কোন্ লজ্জায়
বলিব আহারই উদ্দেশ্য? এমন অনেক সময়
অতিবাহিত হইয়াছে, যখন চেলেপটিতে
চালের অভাব নাই, ময়রার গেলেরীতে
সন্দেশের অভাব নাই, কিন্তু আমার উদরে
খাদ্যের অভাব স্পর্শিয়াছে। এত দুঃখে আর
কোন্ মুখে বলিব এ ভবে আহার করিবার
জন্যই আসা যাওয়া?

তার পর ভাবিলাম আমরা অর্থের জন্য

প্রাণপাত করিতেই সৃষ্ট হইয়াছি। কিন্তু প্রাণপাত করিলেও অর্থ লাভ হয় কি? লোকে বলে টাকায় টাকা টানে; যাহার অর্থ আছে তাহারই অর্থ লাভ হয়। আর যাহার মূলধন, পৃথিবীর ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট অঙ্ক বিশেষ, কোন প্রকার যোগ বিয়োগাদির ফলে তাহার সম্পত্তি কিছু বাড়িতে পারে, একথা কোন গণিত শাস্ত্রবিৎ বলেন না। যিনিসহস্র পতি, তিনি লক্ষপতিকে এবং লক্ষপতি কোটীপতিকে, একটু আদর আপ্যায়িত করিয়া, কিঞ্চিৎ আহার করাইয়া, বড় পরিতৃপ্ত হন। কিন্তু আমাদের মত দুঃখীর মুখ চাহিতে কজন দুঃখী আছে? ব্যাসদেব ঠাকুর যদি মহাভারতের দ্বিতীয় সংস্করণ করিবার অবকাশ পাইতেন, তবে নিশ্চয় লিখিতেন, ধনিনঃ ভরকৌন্তেয়, অর্থাৎ তৈলাক্তকে তৈল দান কর। সহস্র গুণ থাকিলেও নির্ধনের পক্ষে

ধনোপার্জ্জন সহজ নহে। নিকটস্থ হউক বা দূরস্থ হউক বা অতি দূর দূরস্থ হউক, যদি কোন ধনীর সহিত তোমার সম্বন্ধ বা সহযোগ না থাকে, তবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দীর্ঘতম উপাধি সত্ত্বেও তুমি উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিবে না। কবি বলিয়াছেন :—"Every door is barred with gold, and opens but to golden keys."

আবার অন্যদিকে ভাবিয়া দেখ, প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়া লাভ কি? এক পেট বই কখনও দুপেট খাইতে পারিব না; সার্দ্ধ তিন হস্ত পরিমিত ভূমির অধিক দখল করিয়া, এ শরীরের আলস্য ত্যাগ করিতে পারিব না; তবে পাহারা দিয়া শান্তি নষ্ট করিয়া, পরের জন্য আপনার সিন্দুকে অর্থ সঞ্চয় করিব কেন? অনেক সম্পত্তি রাখিয়া গেলে যে বংশধরগণ, সুশিক্ষিত এবং সচ্চ-

রিত্র হইবার পক্ষে সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন, ইহার প্রমাণ নাই। বরং ইহা দেখিয়াছি, যে দরিদ্র সুশিক্ষিত এবং সচ্চরিত্র হইয়া সমাজের দৃষ্টান্ত স্থল হইয়াছেন ; কিন্তু অনেক ধনী সন্তান সংসারকে পাপভারে পীড়িত করিয়া আইনের গ্রন্থে দৃষ্টান্ত বিশেষ হইয়াছেন মাত্র। তবে হে ঈষপ্ প্রশংসিত শৃগাল, এস, তোমার সঙ্গে একস্বরে বলি "আঙ্গুর বড় টক," এ সংসারে ধনরত্ন বড় অসার।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে জ্ঞান বাড়িল ; এই শারীরিক দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া, ভৌতিক কথা অগ্রাহ্য করিয়া, আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। আহারের জন্য ও ধনের জন্য জীবন নয়, তাহা বুঝিলাম ; তবে স্বীকার করি যে, জীবনের জন্য যে আহার ও ধন নয়, এতটা আধ্যাত্মিক দৃষ্টি আজও খোলে নাই। যাহা হউক তখন মনে হইল

যে আমরা ঘরের গঞ্জনা এবং পরের বঞ্চনা সহ্য করিয়া, সহিষ্ণু হইব বলিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। দেখ, তুমি পরোপকার করিতে চাও, পরের ছেলের হাতে কিছু মিষ্ট তিক্ত পদার্থ দিতে চাও, সাবধান, অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত হইতে না পারে, কিন্তু গৃহিণী বকুনী প্রস্তুত করিতে ভুলিবেন না। বন্ধুর উপ-রোধ একটু মন্দ হজম কর, যদি না পার তবে তাঁহার আদর অভ্যর্থনা, তোমার পক্ষে বদহজম হইয়া রহিল। একদিন এক পাদ্রি সাহেব উপদেশ দিতেছিলেন, "Do not put your trust in money" অর্থাৎ কেহ অর্থে বিশ্বাস করিও না। একথা না শিখাইয়া তিনি যদি উপদেশ দিতেন, Do not put your money in trust, অর্থাৎ টাকা কড়ি বিশ্বাসী লোকের হস্তে স্থাপন করিও না তাহা হইলে অনেকের বহু ক্লেশার্জ্জিত

অর্থ, খর্ব্বস্থূলতনু লম্বোদর সাহুর লোহার সিন্দুক, উপভোগ করিত না। কিন্তু আমার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে একটু ভুল আছে তাহা এখন বুঝিতে পারিয়াছি। দেখিয়াছি, পরোপকার করিয়াও গৃহিণীর আদর পাওয়া যায়; কারণ, একদিন সুবর্ণালঙ্কার গড়াইয়া বিস্তর টাকা মজুরী দিয়া, সেকরাকুলের উপকার করিয়া, অনেক আদর ভোগ করিয়াছি; এমন কি মাছের মুড়ো খাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, গৃহিণী, তাঁহার নিজের মুড়ো পর্য্যন্ত খাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আরো দেখ, প্রতিবাসীও সকল সময় ঠকায় না। আমার একটা কলাগাছ প্রাচীরের উপর দিয়া এক বিজ্ঞানবিতের গৃহের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। যখন কলা পাকিল, তখন উদ্ভিদবিদ্যাবিৎ মহাশয় নিজে কলার কাঁদিটি কাটিয়া আমাদিগকে দিয়া গেলেন;

তবে উপরের দিকের ৫।৬ ছড়ি যাহা দেখা গেল না, সে সম্বন্ধে ইহা বলিয়া গেলেন যে, প্রাচীরের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িলে ঠিক নীচের দিকে, অর্থাৎ মোচার কাছ বরাবর, এক আধ ছড়ি বই কলা ফলে না। কলাত খাইলামই, উপরন্তু বিনা পয়সায় এতখানি বিজ্ঞান শিক্ষা !

সুতরাং দেখিতে পাইতেছি যে, আমার জীবনের উদ্দেশ্য সহজে স্থির হইবার নয়। একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, যখন কোন চিন্তায় পীড়িত হও, তখন সকল ভুলিয়া, একবার কবিতার পাখায় ভর করিয়া ঊর্দ্ধে উড়িও। এই যে আমি, জীবনের উদ্দেশ্য নির্ণয়ে অক্ষম, আমি কোথায় উড়িব ? আর আমি কবিতার পাখাইবা কোথায় পাইব ? চতুর্দ্দশটী অক্ষররূপ পালক সংগ্রহে আমি কাতর নহি, কিন্তু ভাবিইবা কি,

লিখিইবা কি ? আমি স্বদেশী বিদেশী কবিতা গ্রন্থ যত উদ্ঘাটন করি, তত দেখিতে পাই যে, আমার বর্ণনার জন্য কেহ কিছু অবশিষ্ট রাখিয়া যায় নাই। যেগুলি অবর্ণনীত আছে, তাহাও নাকি বর্ণনার বিষয়ীভূত নহে। আমি সন্ধ্যার দুই দণ্ড পূর্ব্ব হইতে কাগজ কলম হাতে করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া আছি। সে সন্ধ্যাও বহিয়া যায়, আমি লিখিব কি ? সকল বিহঙ্গ বিহঙ্গিনীই কুলায় ফিরিল, কেবল "উন্মত্তবদ্ভ্রমতি মজ্জতি মুক্তপর্ণঃ, কান্তাবিয়োগ সময়ে নিশি চক্রবাকঃ"। আজানুলম্বিত সাটী পরিহিতা পৈঁচাবিভূষিতপ্রকোষ্ঠা রাখালপত্নী, রাখালকে প্রত্যুদ্গামন করিতেছেন, এবং উভয়ের অভ্যা-ন্তরস্থ ধেনু "দিনক্ষপা মধ্যগতেব সন্ধ্যা" শোভা পাইতেছে। অথবা, সন্ধ্যামালতী ফুটিয়া উঠিল, সমীরণ মৃদু বহিল; আকাশের

রাগ আকাঙ্ক্ষা মিলাইল। এই সকল কথা চিন্তা করিব? কিন্তু এ সকলত পরের ব্যবহৃত কথা, প্রাচীন কথা; হউক, ক্ষতি কি? যদি সেগুলি কবিতার বিষয়ীভূত তবে কবিতা লিখিতে গিয়া বা ভাবিতে গিয়া সেগুলি বাদ দিব কেন? প্রতি বসন্তেই কানন নবকুসুমিত হয়; কোকিল কুহু কুহু করে, ভ্রমর ঝঙ্কার দেয়। বসন্ত, কখনও ফুল ও কোকিল ছাড়া হইতেই পারে না। প্রকৃতির উদ্যানে যেকালে যাহা বিকশিত হইবার, সেইকালেই তাহা বিকশিত হয়; তবে কবিতার বেলায় নূতনত্ব দেখাইতে গিয়া, একটা অকাল কুষ্মাণ্ড সৃষ্টি করিব কেন? যাহা একাল সেকালে কবিতায় ফুটিয়া আসিয়াছে, আমার কবিতায় তাহা ফুটিতে পাইবে না কেন?

তবে আয় সন্ধ্যা আয়! সেই প্রাচীন সৌন্দর্য্য, প্রাচীন মোহ, প্রাচীন শান্তি লইয়া

আয় ! দিবসের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রপীড়িত, রৌদ্র-তপ্ত, শোকতাপ জর্জ্জরিত, বিষাদক্লিষ্ট হৃদ-য়ের জন্য, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগ্রাসী, প্রশান্ত অন্ধকার লইয়া আয় ! দর্শন বিজ্ঞানের প্রখর আলোকে উত্তপ্ত ও উদ্বিগ্ন মস্তিষ্কের জন্য একবার সান্ত্বনার শীতল ধারা লইয়া আয় ! আর সন্ধ্যা, এই যে আমি সতত জিজ্ঞাসা করিতেছি :—

"যে জগতে জীবগোষ্ঠী কোটি পরিমিত
জগৎ যেখানে অণু সৃষ্টি তুলনায়,
সে বিশ্বে হে নারায়ণ
আমার কি প্রয়োজন,
দাঁড়ায়ে সৃষ্টির কূলে হৃদয় স্তম্ভিত,
আমি কারে চাই হরি কে আমারে চায় ?

এই যে আমি অন্ধকারের পানে চাহিয়া হতাশ হইয়া বলিতেছি :—

"জীবনের এ আহবে. শেষ ফল কিবা হবে ?

শেষ মৃত্যু, তারপর কি রবে আমার ?
দীক্ষিত কর্ত্তব্য পথে, শিক্ষিত জীবন ব্রতে,
এ মোর জীবন, প্রভু, কিবা হবে তার ?"

আমার সে জিজ্ঞাসার উত্তর দাও। এ রহস্যময় প্রহেলিকাময় জীবনের, নিগূঢ় মীমাংসা, তোমার ঐ অন্ধকারে লুকাইয়া আছে, একবার সেই অন্ধকারের অন্ধকারে ডুবিয়া সকল রহস্য উদ্ভেদ করি।

এই যে জীবন সমুদ্রের বেলা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ, প্রতিষ্ঠা বিসর্জ্জন, প্রেমবিরহ-রূপ, তমালতালিবনরাজিনীলা, ইহার দিকে চাহিয়া আর কতদিন রহিব ? কতদিন আর বেলানিল কেতক-রেণু বহিয়া আমোদ দান করিবে ? যেদিন এ সুরম্য তীরভূমি পশ্চাতে পড়িয়া রহিবে, সম্মুখে দেখিব কেবল সেই আতঙ্কপ্রদ উত্তাল তরঙ্গময় ফেনিলাম্বুরাশি ; যেখানে,—

"আকাশের শ্রান্ত পাখা দূরসিন্ধু কোলে,
অসীমে না পেয়েদিশে. এলায়ে গিয়েছে মিশে;"
সেদিন কি হইবে? এ জীবন সমুদ্রের পর-পারে কি? জীবন না মৃত্যু? নির্ব্বাণ না জাগরণ?

যাহাই হউক তাহাতে বড় একটা কিছু আসিয়া যায় না। যদি জীবনান্তে জীবন নাই থাকে, যদি মৃত্যু অর্থে মহানিদ্রা, চির-সুপ্তি, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? প্রতপ্ত নিদাঘের পর বর্ষা-ধারার মত, দুরন্ত শীতের পর বসন্ত সমীরণের মত, দিবসের শ্রান্তির শেষে এই সন্ধ্যার মত, যদি এই জাগরণময় জীবনের ভবিষ্যতে নিদ্রাময় মৃত্যু, তাহাতেই বা ক্ষতি কি?

"হোক ক্লেশ হোক মৃত্যু বিনাশ নির্ব্বাণ,
যাহোক তাহোক বিধি তোমার বিধান।"

এ জীবন উপভোগক্ষম। বাতুল ভিন্ন

এমন কেহ নাই, যে জীবনকে সুখের আকর বলিয়া না ভাবিবে। কর্ম্মক্ষেত্রের পরিশ্রমে ও কর্ত্তব্য পালনে অনেক সুখ। ঘড়ি যদি জানিত, আর দুই ঘণ্টা পরে তাহার কল বিগড়াইবে, তবুও সে যেমন শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত টক টক করিয়া অগ্রসর হইত; তেমনি, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমরা কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলিয়া যাই ; ভবিষ্যতে যাহা থাকে তাহাই হইবে, তাহার জন্য ভয় কি ? ভাবনা কি ?

আর যদি সত্যসত্যই জীবনের পর জীবন থাকে ; পরলোক থাকে ? এই নিশার অন্ধকারের পর আবার যদি প্রভাত থাকে ; যদি, যাহারা আমাদের কত আশায় কত বাসনায় ভস্ম ঢালিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে আবার দেখিতে পাই ? যে চাঁদমুখ মৃত্যুর পর চুম্বন করিয়াও সুখ পাইয়া ছিলাম, আবার সেই মুখের প্রাণভরা সম্বোধন যদি

শুনিতে পাই ; যে তৃষিত কণ্ঠ পৃথিবীর জলে শান্তি পায় নাই দেখিয়া, বুক ফাটিয়া গিয়াছিল, তাহা নবামৃতে পরিতৃপ্ত দেখিতে পাই ; যে চক্ষু অন্ধকারে নিমজ্জিত দেখিয়া হাহাকার করিয়াছি, তাহা পুনরুদ্দীপ্ত দেখিতে পাই ? সন্ধ্যা ! তুমি আর কতদিন আমাদিগকে অন্ধকারে ডুবাইয়া রাখিবে ? বল দেখি, সে সুখ, তুমি মানবের অদৃষ্টে লিখিয়াছ কি না ? বুঝি লিখিয়াছ ; নতুবা তোমার এ ঘোর অন্ধকার এত স্নিগ্ধ কেন ? নতুবা তোমার এ প্রহেলিকা পূর্ণ হৃদয় হইতে এত শান্তি উৎসরিত হয় কেন ? তবে একবার প্রাণ ভরিয়া আশায় বুক বাঁধি ; তোমার এ অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া বলিঃ—"মহান্ উদ্দেশ্য মূলে অনন্ত মঙ্গল।" *

---

* এই প্রবন্ধে আমার স্বরচিত কবিতা অনেক উদ্ধৃত হইয়াছে।
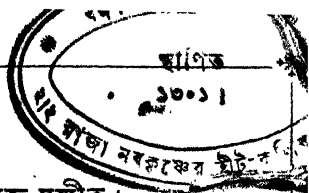
মধ্যাহ্ন সঙ্গীত।

একটি বন্ধুর সহিত অনেক দিন এক সঙ্গে বাস করিয়াছিলাম। লোকের যেরূপ স্বর থাকিলে গান গাহিতে পারে, বলা যায়, সে স্বর তাঁহার কণ্ঠে ছিল। অনেক প্রকার জাতীয় বিজাতীয়, নাট্য, পাঠ্য ও অপাঠ্য সঙ্গীত তাঁহার অভ্যস্ত ছিল। একতন্ত্রী হইতে বহুতন্ত্রী পর্য্যন্ত, খোল হইতে ঢোল পর্য্যন্ত, এমন কোন যন্ত্র ছিল না, যাহার সাক্ষাৎ পাইলে একবার তিনি করাঘাত না করিয়া ছাড়িতেন। এক সঙ্গে থাকিতাম বলিয়াই হউক, অথবা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণেই হউক, আমি কখন তাঁহাকে গান শুনাইতে অনুরোধ করি নাই; তবে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শুনাইতে ছাড়িতেন কি না, সে কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কখনো

অনুরোধ করি নাই, তবে একদিন করিয়া-ছিলাম। একদিন, চৈত্র মাসের দ্বিপ্রহর; প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড পৃথিবীকে লণ্ডভণ্ড করিয়া তুলিয়াছেন, পড়িতে পারা যায় না, ঘুম পায়, শুইয়া সুখ নাই, বিছানা বড় গরম; কিন্তু তখনো সেই রৌদ্রে অশ্বত্থ বৃক্ষের ডালে বসিয়া, অনেক কিচির মিচির শব্দ পরাভূত করিয়া, বসন্তের প্রিয়পাখী, বিরহিণীর হৃদয় অপেক্ষাও অধিক উত্তপ্ত বালুকাময় প্রান্তরে, তাঁহার কুহুরব ছড়াইতেছিলেন। শুনিয়াই আমার কবিতা লিখিতে ইচ্ছা গেল; অল্লা-য়াসেই এক চরণ লিখিয়া ফেলিলাম: "কিসুখে ডাকরে পাখী দুপুরের রোদে," আর এক চরণ কিছুতেই মিলিল না; "রোদে"র সঙ্গে মেলে অভিধানে এমন শব্দের অভাব অনুভব করা গেল; একটি পাইয়াছিলাম, সেটি বোঁদে; একবার ভাবিলাম লিখি, "থাম তুমি বাছা

মোর খেতে দিব বোঁদে"। কিন্তু মনে মনে যে সকল কথা লিখিব বলিয়া বসিয়াছিলাম, তাহার একটিও নাকি প্রকাশ করা গেল না; ফুল, পাখী, সমীরণ, জ্যোৎস্নালোক, হাসি-হাসি মুখখানি, এগুলির একটিকেও নাকি স্থান দিয়া উঠিতে পারিলাম না, সুতরাং সেই সুমিষ্ট বোঁদেময় চরণের শরণ পরিত্যাগ করিলাম। কিন্তু আমার কবিতাবাত্তালোড়িত হৃদয় কিছুতেই যেন আর থামেনা গোছ হইয়া উঠিল। দুর্ব্বুদ্ধি আমার, তাই কখনো যাহা সজ্ঞানে অজ্ঞানে, শয়নে স্বপনে করি নাই, তাহা করিলাম। বন্ধু, গম্ভীর ভাবে বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে একটি গান গাহিতে বলিলাম। গান গাহিবার পরিবর্ত্তে তিনি আমার অনুরোধের যে উত্তর দিয়াছিলেন, জীবনে তাহা ভুলিবনা। যদি তিনি সেই উত্তরটি তাঁহার সুকণ্ঠাভ্যন্তরে চাপিয়া রাখিয়া,

তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার বিবিধ-বাদ্যযন্ত্র পীড়ন-জনিত কীণচক্রগরিষ্ঠ শ্রীহস্তে চপেটাঘাত করিতেন, তবে আমার কোন অসন্তোষের কারণ থাকিত না; বরং তাঁহাকে "বিদ্যালয়ের শিক্ষক হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতাম। বন্ধু আমাকে একটু বিদ্রুপের হাসি হাসিয়া বলিলেন যে মধ্যাহ্নে সঙ্গীত হয় না। মানুষ সকল ক্লেশ বহিতে পারে, কিন্তু যাহাতে তাহার আত্মাভিমানের ঘাড়ে হাত পড়ে, তাহা কিছুতেই সহিতে পারে না। সঙ্গীতে আমার স্বরও নাই, সুতরাং কোন অভিমানও নাই। কিন্তু সকল বিষয়েরই একটু সাধারণ জ্ঞান আছে, এমন অহঙ্কার কাহার নাই? গান গাহিতে নাপারি; কিন্তু তাই বলিয়া আমার ক্ষুদ্র একটি প্রশ্নে একরাশি ব্যাকরণ ও অলঙ্কারের ভুল থাকিবে; অথবা বুদ্ধি নামক সূক্ষ্ম পদার্থের অভাব বুঝাইবে, ইহাকি প্রাণে

সহে ? সে বিদ্রুপের হাসি শেলের মত প্রাণে বিঁধিল।

ভাবিলাম, মধ্যাহ্নে কি সঙ্গীত হয় না ? অরুণের তরুণচ্ছটা, উষার কিশোর কান্তি ও তদীয় চম্পক অঙ্গুলি-স্পর্শোদ্দীপ্ত মেঘ-মালার স্নিগ্ধশ্যামলাঙ্গপরিশোভিনী রক্ত-রেখা, না থাকিলে কি কবিতা হয় না ? সঙ্গীত ফোটে না ? দিবসের শ্রান্তির অবসানে, বিশ্ব যদি অন্ধকারের গর্ব্ভে একবার না ডুবিয়া যায়, যদি চন্দ্রালোক, অলস হৃদয়ে, ক্লান্তিপূর্ণ সুষুপ্ত বিশ্বের মুখচুম্বন নাকরে, তবে কি, কণ্ঠস্বর একটু ঘুরিয়া পেঁচিয়া, একটু অষ্টবক্র হইয়া, পোঁ পোঁ খ্যান্ খ্যান্ সমভিব্যাহারে, শ্রোতার শ্রবণবিবর তাড়না করিতে পারে না ? এবং সমিল বা অমিল, চতুর্দ্দশটি অক্ষর-সম্বলিত দুচারি খানি চরণ, বিলম্বিত হয় না ? মধ্যাহ্নের কি সঙ্গীত নাই ?

শুনিয়াছি প্রাচীন কুরসিকেরা সারঙ্গ, গৌড়-সারঙ্গ প্রভৃতিকে মধ্যাহ্নে স্থান দান করিয়াছিলেন, কিন্তু একালের সুরসিকেরা এবং বিশেষ ভাবে আমার বন্ধু, তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া বসিয়াছেন। কে সুরসিক কে অরসিক, বুঝিতে পারিলাম না। যাঁহারা বৈশাখের রৌদ্রে, দরজা জানালা বন্ধ করিয়া পাখারবাতাস সেবনকরিতে করিতে, কর্ম্মময় পৃথিবীর বক্ষে নিস্তব্ধ হইয়া, একমাত্র নাসিকাটী সচেতন রাখেন, তাঁহারাই সুরসিক ; না, যাঁহারা মধ্যাহ্নের প্রস্ফুটরূপে, পূর্ণ যৌবনের শোভা সন্দর্শন করেন, রৌদ্রের অগ্নিময় তাপে প্রপীড়িত, পরিশ্রান্ত, তৃষিত স্বর্গমর্ত্তে বিশ্বপ্রাণের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিতে পান, এবং কোলাহলময়, অবিরত কর্ম্মনিরত, স্বেদ-সিক্ত মনুষ্যলোকে, জীবন গৌরব ও উৎসাহের সঙ্গীত, সাকার সচল ও স্পর্শক্ষম দেখিতে পান, তাঁহারা সুরসিক ?

বড় রাগ হইল ; একখানি বেত সম্মুখে পড়িয়াছিল, অন্যমনে সেখানি হাতে তুলিয়া গৃহমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলাম। বেত্র যে বন্ধুপৃষ্ঠে পড়িয়া, করুণরসাত্মক সঙ্গীত উদ্গীরণ করিবে, তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তবে ঘরের ইটি সেটি, টেবিল খানি, চেয়ার খানি একটু ধীরে ধীরে নিপীড়িত হইতেছিল, এইমাত্র। কিন্তু তাহাতে ঠক্ ঠক্, ঢ্যাব্ ঢ্যাব্ ভিন্ন অন্য কোন শ্রুতি-মধুর শব্দ নিসৃত হয় নাই। সহসা বেত্রখানি একখানি মোটা রকম পুস্তকের বাঁধামলাটে লাগিয়া ঠক্ করিয়া উঠিল। অনুসন্ধানে দেখিলাম সেখানি মেকলে সাহেবের প্রবন্ধ-পুস্তক। এই দুপ্রহরের সময়, কি পাপে সেই মহাপুরুষের এই দণ্ড, ভাবিয়া পুস্তক উদ্ঘাটন করিলাম, প্রথমেই চোখে পড়িল Milton! দুচারিছত্র পড়িয়াই ক্রোধ অধিক

উদ্দীপ্ত হইল; যদি পুস্তকখানি নিজের না হইত তবে উহাকে বেত্রাঘাত-বিদারিত-হৃদয় করিয়া ছাড়িতাম। দেখিলাম মেকলে এক-জন মধ্যাহ্ন সঙ্গীত বিরোধী। তাঁহার বিশ্বাস এই যে, পৃথিবীর যখন শৈশব ছিল, যখন মনুষ্য সরল কুসংস্কার পূর্ণ নেত্রে জগচ্ছবি নিরীক্ষণ করিত, তখনই প্রকৃত কবিতা ফুটিতে পারিয়াছিল। আর একালে, সভ্যতার চাপে, বিজ্ঞানের তাপে, দর্শনের শাপে, কবিতা বিদায় লইতেছেন। যিনি প্রাচীন ইতি-হাসের গোটাকতক বাছাবাছা ঘটনা খুঁজিয়া লইয়া, চতুর্দ্দশ অক্ষরের কারাগারে ফেলিয়া, কবি হইবেন বলিয়া সাধ করিয়াছিলেন; একথা তাঁহার উপযোগী বটে। শৈশব হউক, যৌবন হউক, বার্দ্ধক্য হউক, কোন্ অবস্থায় কবিত্ব নাই? যাহা হোমর ও বাল্মীকিতে ছিল, সেক্ষপীয়র ও কালিদাসে তাহার ক্ষয়

[illegible] না ; এবং গেটে, হিউগো, টেনিসন, লংফেলো ও বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে তাহা পাওয়া যায়না কে বলিবে ? কবিতা কেবল "রাকাশশিশোভনা গতঘনা যামিনী" লইয়াই ব্যস্ত নয়, অমাবস্থার দুর্দ্দিনে ও চৈত্রের দ্বিপ্রহরেও তিনি সর্ব্বত্র বিচরণ করেন। সঙ্গীত, কোকিলেও আছে, পেচকেও আছে ; চন্দ্রে আছে জোনাকিতেও আছে। বিধাতার মহিমারচিত এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা কবিতাশূন্য। নাটকের নায়ক, কেবল পরমরূপবান ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন পুরুষই হইবেন, কে বলিল ? যাহারা অন্ধ খঞ্জ, দীন দুঃখী, চপল পাপাসক্তচিত্ত, তাহাদিগেরও অন্তরে কত দেবত্ব, কত মাহাত্ম্য আছে, যাহার চক্ষু নাই, সে দেখিবে কিরূপে ? তোমার সীতা, হেলেন, শকুন্তলা, দেস্‌দিমোনা, মার্গারেট একদিকে ; আর, ফ্যান্-

টাইন্, ইপোনাইন্, এলিস্, ভ্রমর ও জেন-ইয়ারে আর একদিকে। কুটিলাঙ্গ বলিয়া মন্থরা কুটিলা, কিন্তু সৌন্দর্য্যের প্রতিমা হইয়াও গুইনিভিয়র দুঃশীলা। সেকালে একালে এই স্থানে প্রভেদ। পূর্ব্বে যেগুলি কবিতার অবিষয়ীভূত ছিল,অথবা নীচ বলিয়া তাঁহাদের চক্ষে ঠেকিত না, একালের দৃষ্টি, সেই পরিত্যক্ত আবর্জ্জনার মধ্য হইতে রত্ন বাছিয়া বাহির করিতেছে। বালক কবি লিখিয়াছিলেন, "A thing of beauty is joy for ever." প্রবীন কবি লিখিয়াছেন "The mind's internal heaven shall shed her dews of inspiration on the humblest lay." কবিতা ফুরায় না। এ জগৎ নিত্য কবিতা পরিপূর্ণ। আধ আলো আধছায়ার কবিত্ব, প্রখর কিরণের কবিত্বকে অগ্রাহ্য করিতে পারে না। আর যদি আধ আলো আধছায়া

লইয়াই কবিতা, তবে সে ছায়া কি দ্বিপ্রহরেও নাই? চক্ষু, দিবসের রৌদ্রে ঝলসিয়া যায়; সুতরাং তখনো দূর দূরান্তর সেই অন্ধকারের ছায়ায়। দর্শন বিজ্ঞান, অনেক কুসংস্কার ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। সত্য; কিন্তু প্রাচীন সংশয় এখনও দূর হইল না। ছায়া এখনও রহিয়াছে। দর্শন বিজ্ঞানে চক্ষু ঝলসিয়া যায়; কিন্তু জগৎতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, জীবন মরণের তত্ত্ব, চিরদিনই অন্ধকারে। শ্রেষ্ঠকবিতা চিরদিনই জীবনরহস্য লইয়া; সুতরাং কবিতার উৎস অফুরন্ত।

অনেকে বলেন যে দেখ, চারিদিকে ব্যবসা বাণিজ্যের স্রোত; আমদানী রপ্তানি ও বোঝাই লইয়া পৃথিবী ব্যস্ত। রাত্রিদিন চাকার খড় খড় ঘড় ঘড়। ইঞ্জিনের বংশীনিনাদে, এ সভ্যতার বৃন্দাবনে, প্রাণও গেল উপরন্তু কানও গেল। এ টাকা পয়সার

ঝঞ্ঝনানিতে কি কোকিলের স্বর শুনিতে পাওয়া যায়? ইঞ্জিনের ধোঁয়ার গন্ধে মাথা ভার, মল্লিকাদির সুবাস পাইবার উপায় কি? আমি বলি, যে কোকিল ও ফুল লইয়াত অনেক কবিতা হইয়াছে, কিন্তু সেগুলি ছাড়িয়া. একালের ব্যবসা বাণিজ্যের কবিতা কি লেখা যায় না; কল কারখানায় কি কবিতা নাই? আমার বন্ধু কখনো কখনো গাহিয়া থাকেন এবং তাঁহার সেতারকে গাওয়াইয়া থাকেন, "কি কল গড়েছে সাহেব কোম্পানী।" আমি সে গানের কথা বলিতেছি না। আমি যে কবিতার কথা বলিতেছি, মার্কিন মহাত্মা হুইটম্যান্ তাহার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। হুইটম্যান সুকবি না হইলেও প্রকৃত পক্ষে মধ্যাহ্নের কবি। যে দৃশ্যে তোমার আমার রস শুকাইয়া যায়, সেই দৃশ্যে তাঁহার কবিত্বের প্রতিভা ফুটিয়া

উঠে। তিনি সহরের রাস্তায় ঘাটে, বাজারে ও কর্ম্মক্ষেত্রে, যে কোলাহল, তাহাকে লইয়াই কবিতা লিখিয়াছেন। এই কোলাহলের মধ্যে যে জীবন বিকশিত, এই নিরবধি পরিশ্রমের মধ্যে যে আনন্দ প্রকাশিত, তিনি তাহারই উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। যে দিন ভারতবর্ষ এই সংগীতের মাহাত্ম্য বুঝিবে, সেইদিন দুর্দ্দশার শেষ হইবে। সকলে মিলিয়া চৈত্রের দ্বিপ্রহরে এই অধীনতার প্রখর সূর্য্যতলে, একবার কর্ম্মের মধ্যাহ্নসঙ্গীত গাও; একবার গৌড়সারঙ্গ ধর। হে আমার সংগীত অভিমানী বন্ধু, এ দুপ্রহরে ঘুমাইও না; আমার এই প্রথম ও শেষ অনুরোধ রক্ষাকর, একবার গাও।

সম্পূর্ণ।